মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১সি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
দুলাল বল
৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬০
দ্বিতীয় মুদ্রণ :
আষাঢ়—১৩৬১
তৃতীয় মুদ্রণ :
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৩

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীপরিমল গোস্বামী
পরমবন্ধুবরেষু

বাহাত্তর নম্বরের একেবারে চক্ষুস্থির।

হ্যাঁ, চক্ষুস্থির ছাড়া আর কি বলে অবস্থাটা বোঝাব ?

বাহাত্তর নম্বর মানে তো তিনি, ওই নম্বরের বনমালী নস্কর লেনের একটি বেশ বয়স্ক বাড়ির তেতালার টঙের ঘরে যিনি বেশ কিছুকাল বিরাজ করছেন।

আসল তিনি, আর ফাউ হিসেবে আমরা ক'জন।

তা সেই তেতালার টঙের ঘরে তিনি, মানে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঘনাদার সঙ্গে আমাদের, মানে শিবু শিশির গৌর ও আমার চক্ষুস্থির তো তখন বটেই।

চক্ষুস্থির না বলে চক্ষু চড়কগাছও বলা যায় অবশ্য, আর আমাদের তালিকাটা একটু সংশোধন করে শিশিরকে বাদ রাখা যায়। শিশির তখন সত্যিই অনুপস্থিত।

শিশির থাকুক বা না থাকুক আমাদের চোখের অবস্থার তাতে হেরফের কিছু অবশ্য হবার নয়। দুদিন ধরে রীতিমত বিহার্সালে নিজেদের পাকিয়ে, জোড়া জোড়া চোখ একেবারে ছানাবড়া করে আমরা তখন যে যার পার্ট সিনেরিও মাফিক করে যাচ্ছি।

সত্যি কথা বলতে গেলে পার্ট যা করতে হচ্ছে তা এমন কিছু শক্ত নয়। ব্যাপার যা তখন ঘটেছে, তার হাড়-হদ্দ জানা থাকলেও চোখগুলো বুঝি আপনা থেকেই কপালে উঠে যায়।

চিত্রনাট্য-টা গোড়া থেকে শোনালেই ব্যাপারটা বোঝার অসুবিধা থাকবে না।

প্রথম লং-শট। বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের তেতালার টঙের ঘরে যাবার ন্যাড়া সিঁড়ি।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে শিবু সেখান দিয়ে ওপরে উঠছে। শিবু তেতালার ছাদ পর্যন্ত ওঠার পরই কাট। তারপর ছাদ থেকে ক্যামেরা শিবুকেই

ধরে প্যান করে টঙের ঘরের ভেতর। সেখানে পাতা তক্তপোষের ওপর গৌর ও আমি বসে অবাক হয়ে শিবুর দিকে তাকাচ্ছি আর ঘনাদা ওই তক্তপোষেরই অন্য প্রান্তে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে একটি ছোট আয়নায় নিজেকে নিরীক্ষণ করছেন।

পরের শট-এ অ্যাকশন, মানে যাকে বলে খেল শুরু।

ব্যাপার কি। শিবুর বিমূঢ় জিজ্ঞাসা, বাহাত্তর নম্বরটা কি হাসপাতাল হয়ে উঠল নাকি?

হাসপাতাল? সে আবাব কি?—গৌর ও আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি তখন।

হাসপাতাল না হলে এত ডাক্তার-বদ্যি যন্তরপাতির আমদানি কেন?

আড়চোখে ঘনাদার দিকে তখন একবার তাকিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে।

না, শিবুর ভগ্নদূতের পার্টটা একেবারে বিফলে যায়নি, ঘনাদার নিজের মুখ নিরীক্ষণ করায় একটু ছেদ পড়েছে। মুখটা না হলেও কানটা এদিকে ফেরানো।

তারস্বরে এবার তাই বিমূঢ় বিস্ময় প্রকাশ করতে হয়েছে।—ডাক্তার-বদ্যি যন্ত্রপাতি আসছে বাহাত্তর নম্বরে? কি বলছিস কি! মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর!

মাথা খারাপ হওয়ার অপরাধ কি? শিবুর ক্ষুব্ধ স্বর—চেয়েই দেখনা একবার।

সেই চেয়ে দেখার পর চক্ষুস্থির না হয়ে পারে?

সিঁড়ি দিয়ে যেন মিছিল করে যাঁরা উঠে আসছেন তাঁদের পরিচয় সাজ-সরঞ্জামেই অনেকখানি মালুম।

এটা কি মিঃ দাসের ঘর?—প্রথম জনের জিজ্ঞাসা, তাঁর হাতের ব্যাগটার মর্ম যদি প্রথমে নাও বোঝা যায়, গলায় ঝোলানো স্টেথিস্কোপটা ভুল করবার নয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাই নিজেদের বিস্মিত কৌতূহলটা প্রকাশ করেছি—কিন্তু আপনি ?

আমি ডাঃ সোম।—গম্ভীরভাবে যেন আমাদের বকুনি দিয়ে বলেছেন ভদ্রলোক,—মিঃ দাশের প্রেসার নিতে এসেছি।

কি নিতে এসেছেন ? প্রশ্নটা সবিস্ময়ে করে ফেলার পর আমাদের হাঁ করা মুখগুলো যেন আর বোজাবার অবসর মেলেনি।

প্রেসার যিনি নিতে এসেছেন তাঁর পেছনে ব্যাগ হাতে আরেক মূর্তি, আর এ তুজনের পেছনে তু'তুজন বাহকের মাথায় ছোটখাট একটা যন্ত্রাগারের নমুনা চাপিয়ে অন্য একজন।

আমাদের অনুচ্চারিত প্রশ্নগুলো যেন অনুমান করে নিজেরাই তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রেসার নেবার জন্যে যিনি আগে ঢুকেছেন তাঁর পরের জন আমাদের যেন আশ্বস্ত করবার স্বরে বলেছেন—ভাবনার কিছু নেই। আমি শুধ্ একটু রক্ত নেব।

অ্যাঁ ! রক্ত নেবেন ? ঘনাদার ?

আমাদের সম্মিলিত আর্তনাদের ওপরই তৃতীয় জন যেন বরাভয় দেবার মত করে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন—আমার কার্ডিওগ্রাম।

ভ্যাবাচাকা ও ভয়ে-কোঁকড়ানো চেহারা নিয়ে ওরই মধ্যে ঘনদার দিকে একবার চেয়ে দেখে নিয়েছি।

হ্যাঁ, ওষুধ ধরেছে বলেই মনে হচ্ছে। ঘনাদা অন্তত আর্শিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর ঘরের দেওয়ালের কেরাসিন কাঠের শেল্‌ফে সেটা রেখে যে ভাবে কি খোঁজাখুঁজি করবার ভান করছেন সেটা দিশাহারা অবস্থাটা ঢাকবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু বোধ হয় নয়।

চিকিৎসা-জগতের তিন প্রতিনিধির তখন ঘরের ভেতর ঢুকে কোন অস্বস্তি কি আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই। যেন নিত্যই এখানে আসেন যান এমনি স্বচ্ছন্দে নিজেদের মধ্যে তাঁরা একটা আপস করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই।

আপনি রক্তটা আগে নিন ডাঃ গুপ্ত!—প্রেসার মাপার সোম সৌজন্য দেখিয়েছেন রক্ত নেবার গুপ্তকে।

না, না, তা কি হয়! গুপ্ত পাল্টা বিনয় দেখিয়েছেন—আপনার প্রেসার আগে।

'আপ উঠিয়ে' ভদ্রতা মিনিট দশেক ধরে চলেছে তারপর। বিনয়ের পাল্লায় দু'জনের কেউই হারতে না চেয়ে প্রেসারের সোম আর রক্তের গুপ্ত শেষ পর্যন্ত হৃদয়কেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আপনিই কার্ডিওগ্রামটা আগে করে ফেলুন ডাঃ সান্যাল। সমস্বরে অনুরোধ জানিয়েছেন সোম আর গুপ্ত।

বেশ তাই।—এ সম্মানে যেন বেশ বিব্রত হয়ে ডাঃ সান্যাল তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে তাঁর যন্ত্রপাতি খাটাবার তোড়জোড় শুরু করেছেন।

এ নাটক যখন চলছে তখন আমরা তো ভোম মেরে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু যার জন্যে এত আয়োজন সেই ঘনাদা করছেন কি এতক্ষণ ধরে!

ওষুধের কাজও এতক্ষণে শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। তার লক্ষণ কিছু দেখা যাচ্ছে?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঘনাদা তখনও শেল্‌ফটার এ তাক ও তাক ঘাঁটাঘাঁটিতেই যেন তন্ময়। তাঁর ঘরে এত বড় একটা উপদ্রব যে চলেছে সে বিষয়ে যেন হুঁশই নেই।

আচ্ছা হুঁশ হয় কি না দেখা যাক।

এখনও পর্যন্ত বড়ে-ঘোড়া-গজের চালই চলেছে। নৌকো, আর তারপর দাবার চালটা এবার পড়ুক।

নৌকার চালটা কার্ডিওগ্রামের সান্যালই দিলেন। মধুর কণ্ঠে জানালেন—আপনাকে এবার একটু শুয়ে পড়তে হবে মিঃ দাস!

আমরা একদৃষ্টিতে তখন ঘনাদার দিকে তাকিয়ে। বুকের ধুকধুকুনিটা বেড়ে গেছে।

কি করবেন এবার ঘনাদা ? এইবার কি ফাটবেন ?

না, সলতে ঠিক যেন ধরল না। চালটা বুঝি ভেস্তেই গেল।

বিস্ফোরণের বদলে ঘনাদা এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে প্রথম যেন তাঁর ঘরের অনধিকার প্রবেশের ভিড়টা লক্ষ্য করলেন। তারপর অতি সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—শুয়ে পড়তে হবে ?

এ সরল জিজ্ঞাসার মানে, নৌকোর চালটা ফসকেছে। তা ফসকাক, এরপর মোক্ষম দাবার চাল যা আছে, ববি ফিসার হয়েও তা সামলাতে পারবেন না।

সেই দাবার চালই এবার পড়ল। একেবারে যেন সেকেণ্ডের কাঁটা মিলিয়ে শিবুর চেয়েও অস্থির ভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে শিশিরের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ।

কাডিওগ্রামের সান্যাল ঘনাদার সরল জিজ্ঞাসার জবাবে যা বলতে যাচ্ছিলেন তা আর বলা হল না।

সেকি ! আপনারা করছেন কি ? শিশির এসেই একেবারে সকলের ওপর খাপ্পা। এখনও শুধু গজল্লা করছেন ?

আর তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছ কি ?—শিশির আমাদেরও রেহাই দিলে না—হাঁ করে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছ ?

আমরা, মানে—আমরা যেন লজ্জিত হয়ে নিজেদের অসহায় অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। হঠাৎ এই এত ডাক্তার-বদ্যি যন্ত্রপাতি কেন ?

কেন ?—শিশির আমাদের বুদ্ধির জড়তা আর স্মৃতিশক্তির অসাড়তায় যেন স্তম্ভিত—এ ঘরে কেন এত ডাক্তার-বদ্যি জিজ্ঞেস করছ তোমরা ? কিছুই তোমরা জানো না ? গোণা-গুণতি এই তিন জন ডাক্তারকে দেখেই বিরক্ত হচ্ছ ? এখনো তো আর সবাই এসেই পৌঁছন নি।

আরো কেউ কেউ আসবেন নাকি ?—শিবুর একটু শঙ্কিত বেফাঁস প্রশ্ন।

বাঃ, আসবেন না ?—শিশির আমাদের অজ্ঞতাকে যেন তিরস্কার করলে—ই-এন-টি মানে ইয়ার-নোজ-থ্রোট, আই স্পেশ্যালিস্ট, ডার্মাটোলজিস্ট, কিরোপডিস্ট, এক্স-রে ফটোগ্রাফার, মায় সাইকো-অ্যানালিস্ট পর্যন্ত আসছেন। এঁরা কেন আসছেন এখনো জিজ্ঞাসা করতে চাও ? বলতে চাও যে অতবড় গুরুতর ব্যাপারটা ভুলেই গেছ ? কি হয়েছিল মনেই পড়ছে না ?

না, না, পড়ছে পড়ছে।—আমরা যেন হঠাৎ স্মরণশক্তি ফিরে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলাম—আমাদের খুব দেরী হয়ে গেছে কিন্তু। সেই আগের হপ্তা থেকে ঘনাদার শরীর খারাপ, আর আমরা চুপ করে বসে আছি।

চুপ করে বসে আছি !—শিশির এবার আমাদের ওপরই চটল—চুপ করে থাকলে এঁরা সব এলেন কোথা থেকে! সেই শনিবার থেকেই এই ধান্ধায় লেগে আছি। ঘনাদার একেবারে 'থরো' চেকিং না করিয়ে ছাড়ব না।

যাঁর উদ্দেশে এত বড় নাটক তিনি এই মোক্ষম চালে কুপোকাৎ না হয়ে যাবেন কোথায় ?

তাঁর দিকে ফিরে অত্যন্ত যেন কুণ্ঠিত হয়ে শিশির এবার মিনতি জানালে—আপনার ওপর একটু অত্যাচার করব ঘনাদা।

বেশী কষ্ট অবশ্য দেব না।—আশ্বাসও দিলে তারপর—এই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এঁদের যা করবার এঁরা সেরে ফেলবেন।

বেশী কিছু তো নয়।—শিশির ভরসা দেবার কারণগুলো ব্যক্ত করলে—আপনার প্রেসারটা উঠছে না নামছে হাত বেঁধে একটু দেখা, হৃৎপিণ্ডটায় কোন গণ্ডগোল হয়েছে কি না ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রামে তার একটা ছাপ নেওয়া, শরীরের ভেতরের কলকব্জা হাড়গোড়ের গলদ ধরাবার জন্যে এক্সরে ফটো তোলা, আর চিনি কোলেস্টেরল ইউরিয়া ঠিক মাপ মত আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে 'শিরা থেকে একটু রক্ত টেনে নেওয়া। তাও বড়জোর পো খানেক।

পো খানেক!—আমরা রিহার্সেল মাফিক যথারীতি শিউরে উঠলাম—পো খানেক রক্ত নেবে?

হ্যাঁ নেবে তো হয়েছে কি!—শিশির আমাদের ধমকালে—ঘনাদা কি দুধের বাচ্চা যে পো খানেক রক্ত দিয়ে একেবারে দেউলে হয়ে যাবেন? ওই রক্তটুকু থেকে কাজ কি হবে ভাব দেখি? সব কিছু পুরো পরীক্ষার পর ডাক্তারদের আর আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে হবে না। রোগের জড়টি নির্মূল ভাবে ধরে উপড়ে ফেলে দেবেন।

এঁরা তাহলে কাজ শুরু করুন, কি বলেন? শেষ অনুমতি-ভিক্ষাটা ঘনাদার কাছে।

আমরাও তখন উৎসুক ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে। মেগাটন গোছেরই কিছু একটা ফাটবে এই আমাদের আশা।

ঘনাদা তখনও অবশ্য শেল্‌ফের কাছেই দাঁড়িয়ে। হাতে ছোট একটা কাগজের পুরিয়া বলেই মনে হল। এত শেল্‌ফ ঘাঁটাঘাঁটি করে এইটিই বার করেছেন নাকি।

তা যাই করুন, ওই কাগজের পুরিয়া এ সঙ্কট থেকে তো তরাবে না! যে বেড়াজালে ঘেরা হয়েছে, তা কেটে বেরুতে, হয় হার মেনে নাকে খৎ দিতে না হয় বোমার মত ফাটতেই হবে।

আর তাহলেই যা জ্বালা এই ক'দিন উনি আমাদের জ্বালাচ্ছেন সব তার শোধবোধ।

কিন্তু কই? নরম গরম কোন লক্ষণই যে দেখা যাচ্ছে না।

সেই যে বলে অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর—তাই হয়ে গেলেন নাকি! আমাদের আর ডাক্তারদের নিয়ে সপ্তরথীর বেষ্টনে একেবারে ভ্যাবাচাকা ভোম!

একটু উস্কে দিতে হল তাই।

আর দেরী করবেন না ঘনাদা! ডাক্তারবাবুরা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। রোগটা যখন আপনার অমন বেয়াড়া, তখন হদিস পেতে এসব পরীক্ষা তো না করালে নয়।

পরীক্ষা করাতেই তোমরা বলছ?—ঘনাদা যেন নেহাত সরল ভাবে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তর দেব কি, বুকের ধুকপুকুনি তখন বেড়ে গিয়ে আমরা চোখে প্রায় অন্ধকার দেখছি। এত মাথা খাটিয়ে সাজানো এত কষ্টের আয়োজন এমনি করে পণ্ড হবে নাকি? ঘনাদা অকুতোভয়ে সব পরীক্ষায় রাজী হয়ে আমাদের উল্টো ফ্যাসাদে ফেলবেন?

'করো কার্ডিওগ্রাম, নাও রক্ত।' বলে ঘনাদা যদি এখন এক কথায় তাঁর তক্তপোষে গিয়ে শুয়ে পড়েন তাহলে কেলেঙ্কারীর যে কিছু আর বাকি থাকবে না। ডাক্তার সাজিয়ে যাদের আনা হয়েছে তারা যে সব জাল। হাতের শিরা থেকে রক্ত নিতে গেলে নিজেরাই ভির্মি যাবে। রক্ত নেওয়া তো দূরের কথা প্রেসার মাপবার যন্ত্রের টিউবটাও যে তারা বাঁধতে জানে না।

আগের শনিবার থেকে অসুখের ছুতো করে এ ক'দিন ঘনাদা যা জ্বালাচ্ছেন তারই শোধ হিসেবে ঘনাদাকে একটু শিক্ষা দিতে সবাই মিলে এই ফন্দিটি এঁটেছিলাম।

যেমন অসুখ অসুখ বলে ঘনাদা আমাদের সব উৎসাহে এ ক'দিন জল ঢেলেছেন, তেমনি তাঁর চূড়ান্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাই করেছি! নিজেদের নয়, বেপাড়ার থিয়েটার ক্লাব থেকে ডাক্তার সাজবার লোক এনেছি ভাড়া করে, তাদের দু'চারটে বোল-চালও শেখানো হয়েছে ঘনাদাকে ভড়কে দেবার জন্যে।

কিন্তু এখন সব কিছুই যে যায় ভণ্ডুল হয়ে। শুধু ভণ্ডুল নয় আমাদের অস্ত্রই বুমেরাং হয়ে আমাদের ওপর চড়াও হবার উপক্রম!

তাহলে উপায়?

উপায় নেই। তবু উল্টো গাওয়া শুরু করে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

পরীক্ষার ঝামেলা অবশ্য বড় কম নয়।—আমি যেন খুঁত না ধরে পারি না।—ডাক্তারদের তো মায়া-দয়া নেই—পরীক্ষার নামে

ক্যাটা ছেঁড়া বাঁধা ছাঁদা ফুটো করে একেবারে জ্ঞান কয়লা করে দেবে।

ঠিক বলেছ।—শিবুর পোঁ ধরতে দেরী হল না—রোগের চেয়ে চিকিচ্ছের জ্বালা বেশী।

আমি হলে তো এখুনি বিদেয় করে দিতাম। গৌর শিশিরের ওপরই যেন গরম হল—শিশিরের যেমন বুদ্ধি!

না, না, শিশিরের দোষ কি?

আমাদের সকলকে থ করে শিশিরের ওকালতি করতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং ঘনাদা।

বুমেরাংয়ের মার এড়াবার আশা তখন ছেড়েই দিয়েছি। বিশেষ করে ঘনাদা শিশিরের স্বপক্ষে যা যুক্তি দিলেন তাতে।

ও তো অন্যায় করে নি—ঘনাদা শিশিরকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন—রোগটা যেখানে বাঁকা আর বেয়াড়া, সেখানে তার হদিস পেতে পুরো পরীক্ষায় তো করা দরকার।

এরপর আর কি আমাদের করবার থাকতে পারে!

হাল ছেড়ে দিয়ে শেষ বে-ইজ্জতির জন্য যখন তৈরী হচ্ছি, তখন ঘাটের কাছে এসে ডুবতে ডুবতে নৌকো আবার ভাসল।

ভাসালেন ঘনাদা নিজেই। শিশিরকে আপাতত ঠেকো দিয়ে বাঁচিয়ে তিনি যা বললেন তাতে অকূলে কূল পেয়ে আমাদের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

ধড়ে প্রাণটা ফিরলেও মাথায় কিন্তু তখন চরকি পাক লেগেছে। লেগেছে ঘনাদার কথাতেই।

পরীক্ষার জন্য এঁদের সব ডাকিয়ে ভালই করেছে শিশির।—ডাক্তার সাজা তিন মূর্তির দিকে যেন অভয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ঘনাদা—কিন্তু এই পুরিয়াটা পেয়ে গেলাম কি না!

পুরিয়া? তার মানে? ও পুরিয়াটা আবার কিসের? তা পেয়ে হলটা কি?

গলার আওয়াজে নয়, আমাদের, মায় সাজা-ডাক্তারদের হতভম্ব মুখের দৃষ্টিতেই কাতর প্রশ্নগুলো ফুটে উঠল।

সে দৃষ্টি দেখেই বুঝি সদয় হলেন ঘনাদা। একটু বিশদ হয়ে জানালেন,—পুরিয়াটা যখন পেয়ে গেছি তখন পরীক্ষা-টরিক্ষার আর দরকার নেই।

ওই পুরিয়া পাওয়ার জন্যেই আর দরকার নেই? বিমূঢ় বিস্ময়টা নবাগতদের মধ্যে ব্লাডপ্রেসারের গলাতেই সরবে প্রকাশ পেল।

ওই পুরিয়াই তাহলে মুশকিল-আসান?—কার্ডিওগ্রামের বিস্ময়ে যেন একটু সন্দেহ মেশানো।

পুরিয়াটা কিসের? রক্ত-পরীক্ষকের প্রশ্নে স্পষ্ট যেন অবিশ্বাসের সুর।

আমরা তখন আবার প্রমাদ গণতে শুরু করেছি।

ভাগ্যের জোরে অনুকূল হাওয়া সবে যখন বইতে আরম্ভ করেছে, তখন এই ডেকে-আনা আহাম্মকগুলো দেয় বুঝি সব বানচাল করে!

শিশির তাড়াতাড়ি তাল সামলাতে তাই বলেছে—পুরিয়ায় নিশ্চয়ই আছে আসল মৃগনাভি। একেবারে তিব্বত থেকে আনা।

না, না মৃগনাভি কেন হবে।—শিবু শিশিরের ওপর টেক্কা দিয়েছে—পুরিয়ায় আছে সূচিকাভরণ, আসল শঙ্খচুড়ের বিষ ছেঁকে তৈরী। ছুঁচের ডগায় ঠেকালেই মরামানুষ চাঙ্গা—

উঁ হুঁ! সূচিকাভরণ নয়।—আমি গুরুগম্ভীর গলায় বলেছি—পুরিয়ার আছে জিন সেঙ্। নেপালের নিরেস রিনসেন নয়, সাই-বেরিয়ার টাইগা থেকে তোলা আসল মাল। একরত্তি পেটে গেলে কাটামুণ্ড জোড়া লাগে! তাই না ঘনাদা?

নাগাড়ে মাঠ-ফাটানো খরার পর আকাশে কোদালে-কুড়ুলে

মেঘের দিকে চাষী যেমন করে চায় তেমনি করে ঘনাদার দিকে চেয়েছি এবার।

বিফলও হয়নি সে চাওয়া।

না।—ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনি অনুকম্পাভরে আমাদের সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে বলেছেন ঘনাদা– মৃগনাভি, সূচিকাভরণ, জিন সেঙ্, কিছুই নয়।

তবে?—আমরা যেন বিমূঢ় বিহ্বল।

পুরিয়াতে আছে –ঘনাদা একেবারে মাপা এক সেকেণ্ডের নাটকীয় ছেদ দিয়ে বলেছেন—শুধু একটু ছাই।

॥ দুই ॥

ছাই!

ওই এক পুরিয়া ছাই দিয়ে সব অসুখ সারাবেন!

যে বেয়াড়া রোগের জড় খুঁজতে গোটা একটা হাসপাতালের পরীক্ষা লাগে, ওই ছাই-ই তার দাওয়াই?

আপনার হাতে ওই ছাইটুকু দেখেই রোগবালাই হাওয়া।

ধূলো-পড়া তো জানি, এ আবার ছাই-পড়া নাকি?

ছাইটা কিসের? সোনাভস্ম? মুক্তোভস্ম?

ঘনাদার মুখে ছাই কথাটা শোনবার পর মিনিট দুয়েক কারুর মুখ দিয়ে কোন কথা অবশ্য সরেনি। ওপরের বিস্ময় উচ্ছ্বাস বিদ্রূপ সব তার পর থেকে শুরু। তার আগে হাঁ-করা মুখগুলো বোজানোই শক্ত হয়েছে।

বিস্মিত জিজ্ঞাসায় শুরু হয়ে মন্তব্যগুলো যখন বাঁকা টিপ্পনির দিকে যাবার উপক্রম করছে, ঘনাদা তখনই মুখ খুললেন।

বললেন— না সোনাভস্ম মুক্তোভস্ম নয়, নেহাত সাদাসিধে কাঠ-পোড়া ছাই।

ওই কাঠ-পোড়া ছাই আপনি পুরিয়া করে ঘরে রাখেন? আর তারই জোরে বলছেন ডাক্তার-বদ্যি সব বিদেয় করে দিতে?

মন্ত্র-পড়া ছাই তাহলে বলুন?

না, মন্ত্র-পড়া নয়।—ঘনাদা নির্বোধদের বেয়াদপি ক্ষমা করে জানালেন—তবে কাজ করে মন্ত্রের মতই। তা না হলে বুকের যা রোগ হয়েছিল, তা নিয়ে সেই লাল বালির রাজ্য থেকে কি আর ফিরতে পারতাম! সেখানেই কবর নিতে হত।

অমন বুকের রোগ নিয়ে বেঁচে ফিরলেন শুধু ওই কাঠ-

ছাইয়ের দৌলতে? অসুখটা কি ঘনাদা?—আমরা অত্যন্ত উৎসুক।

ইলেক্ট্রিক্যাল কনডাক্টিভিটি নষ্ট হয়ে কার্ডিয়াক রীদ্‌ম্ কেটে যাওয়া। অর্থাৎ হৃদয়ের বৈদ্যুতিক বাহিকা শক্তি দুর্বল হওয়ার দরুন হৃদস্পন্দনের ছন্দোপতন ঘটা···

বুঝেছি! বুঝেছি! মূলের চেয়ে গোলমেলে টীকা থামাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলতে হল—কিন্তু রোগটা হয়েছিল কোথায়? রাঙা বালির রাজ্য বলছেন, জায়গাটা রাজস্থান নাকি?

না, না, আর একটু দূর!—ঘনাদা আমাদের একটু বুঝি হদিস দিতে চাইলেন।

তাহলে টাক্‌লা মাকান? শিবু তার অনুমানটা জানালে।

উহুঁ—গৌরই সংশোধন করলে শিবুকে—আর একটু দূর যখন বলেছেন তখন নিশ্চয় সাহারা। তাই না ঘনাদা?

না, সাহারা নয়! ঘনাদাকে যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় গৌরকে হতাশ করতে হল—জায়গাটার আবার ঠিক নামও নেই। নোডস্ গরডি আই বলে কেউ কেউ—তার বদলে আমিই একটা নাম দিয়েছিলাম—ধাঁধিকা।

আপনি নাম দিয়েছিলেন ধাঁধিকা!—আমরা তাজ্জব—এ আবার কি নাম?

আচ্ছা নাম যাই দিন, জায়গাটা কোথায়? কত দূর?

দূর? ঘনাদা যেন মনে মনে হিসেব করবার জন্যই একটু সময় নিলেন, হাঁা, খুব কম করে ধরলে, মোটামুটি কিলোমিটারের হিসেবে হবে—

ঘনাদাকে কথাটা আর শেষ করতে হল না।

এমন একটা মৌকা পেলে ছাড়া যায়!

নিলেম ডাকের মত আমরা তখন ডাকের পাল্লা শুরু করে দিয়েছি।

'মোটামুটি কিলোমিটারের হিসেবে, বলে ঘনাদা থেমেছিলেন।

তাঁর সেই অসমাপ্ত কথার শেষ ফাঁকটুকু ভরাট করতে গৌর হাঁকল, দশ হাজার।

ত্রিশ—শিবু একলাফে এগিয়ে গেল।

চল্লিশ হাজার—হাঁক দিলাম আমি। আমিই বা পিছিয়ে থাকব কেন ?

কিন্তু আমার অমন এগিয়ে যাওয়া কি ওদের সয়! হিংসের জ্বালায় শিবু একটু মুখ বেঁকিয়ে বললে—কত ? চল্লিশ হাজার ?

হ্যাঁ! চল্লিশ হাজার—আমি চেপে ধরে রইলাম গোঁ—তোমরা ইচ্ছে করলে বাড়তে পার!

বাড়বে কোথায় ?—শিবুর হাসিটা বড় বেশী বাঁকা। গোটা পৃথিবীর পরিধি কত জানিস ? জানিস তার ব্যাস কত ?

এটা কি ঠিক ধর্মযুদ্ধ হল ? এমন অন্যায় ল্যাং মারা কি এ খেয়াল সই ? হাতাহাতি লড়াইয়ে কচুকাটা হয়ে আকাশ থেকে বোমা মেরে বাঁধ ভাঙা!

এখন অধর্মের খোঁচার যা অব্যর্থ পাল্টা মার তাই দিলাম। সবজান্তার ভঙ্গি করে মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি মাখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তুই জানিস ? না জানিস তো ভূগোলটা আর একবার দেখে আয়।

এই এক জবাবেই যার কাবু হবার কথা সেই শিবুর হঠাৎ হল কি! মুখে আমার চেয়েও দু ডিগ্রি চড়া বিদ্রূপের হাসি মাখিয়ে সে বললে—ভূগোল দেখতে যেতে হবে না। আমার মুখেই শুনে নে। পৃথিবীর কোন দিকের ব্যাস চাস ?

কোন দিকের ? প্রশ্নটা মনে মনে তখন নিজেকেই করেছি। ব্যাসই জানি না তা কোন দিকের আবার কি ?

কিন্তু ভাঙতে হয় ভাঙব, মচকালে তো চলবে না।

একেবারে যেন মন্থুমেণ্টের ওপর থেকে তাকে কৃপাভরে নিরীক্ষণ করে বললাম—যে দিক জানিস সেই দিকটাই বল না।

ব্লাডপ্রেসার সোম আর কার্ডিওগ্রাম সান্যালদের তখন কিন্তু আর ধৈর্য ধরছে না!

কি বাজে তর্ক লাগিয়েছেন!—রক্তপরীক্ষার গুপ্ত একটু ঝাঁঝিয়েই বললেন—পৃথিবীর ব্যাস আর পরিধি শুনতে এসেছি নাকি! মিঃ দাস কোথাকার কোন মরুভূমির কথা বলছিলেন, আর তার মধ্যে···

ঠিক আছে!—ঘনদাই বাধা দিয়ে যেন উৎসুক হয়ে উঠলেন আমাদের তর্ক শুনতে,—হ্যাঁ, পৃথিবীর ব্যাসের কথা কি যেন বলছিলে?

বলছিলাম পৃথিবীর দুদিকের দুরকম ব্যাসের কথা! দুই মেরুর দিক থেকে পৃথিবীর ব্যাস যা, বিষুবরেখার দিক দিয়ে তো তা নয়। বিষুবরেখার দিক দিয়ে ব্যাস হল বারো হাজার ছ'শো একাশি দশমিক ছয় কিলোমিটার!

শিবুর হঠাৎ হল কি! তার জিভে স্বয়ং সরস্বতী হঠাৎ ভর করেছেন মনে হচ্ছে। ঘনাদারও চক্ষুস্থির করে ছাড়ল বোধহয়।

অবস্থা আমার তখন বেশ কাহিল। তবু রোখ ছাড়লাম না! ঘনাদার নকল করা একটু হাসি হেসে বললাম—তা খুব তো মুখস্থ করেছিস বুঝতে পারছি। কিন্তু তাতে হলটা কি?

হল এই যে, তোমার মাথাটি একেবারে নিরেট বলে প্রমাণ হয়ে গেল!

গায়ে যেন বিচুটি লাগানো এ মন্তব্যটি শিবুর নয়, শিশিরের। শেষকালে শিশিরও শিবুর দলে গেল!

বিচুটির জ্বালাতেই যেন চিড়বিড়িয়ে উঠলাম তাই।

সরেস মাথাওয়ালাদের ব্যাখ্যাটা তাহলে একটু শুনি না। কোথায় আমি হড়কেছি একটু দেখি।

তা দেখতে গেলে একটু ধারাপাত জানা যে দরকার!—শিবুর এখনো সেই খোঁচানো গলা—পৃথিবীর ব্যাস যা বললাম তাতে তার বিষুবরেখার বেড় হয় কত? তিনগুণ করলে দাঁড়ায় আটত্রিশ হাজার

চুয়াল্লিশ দশমিক আট কিলোমিটার। যে-কোন বৃত্তের বেড় তার ব্যাসের মোটামুটি তিনগুণ তা আশা করি জানিস?

হ্যাঁ, মোটামুটি তিন।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম মন্তব্যটা স্বয়ং ঘনাদার।

লজ্জায় যখন সত্যিই অধোবদন হবার অবস্থা, তখন বিপদ-তারণ শ্রীমধুসূদনের মতই তাঁর এক একটি টিপ্পনিতে তখনকার মত হাওয়াটা অন্তত ঘুরল।

কিন্তু শিবু কি সহজে ছাড়ে! এমন একটা বারফট্টাই-এর মৌকা তো রোজ আসে না। ঘনাদার সঙ্গেই তাল দিয়ে ভারিক্কি চালে বললে—হ্যাঁ, মোটামুটি তিন মানে, তিনের পর এক, চার, এক নিয়ে কটা দশমিক আছে।

কটা নয়, অগুণতি!

জয় দর্পহারী মধুসূদন! ঘনাদার গলা দিয়েই তিনি ফোড়নটি কেটেছেন।

শিবু কি একটু ভড়কাল? বাইরে অন্ততঃ নয়। ঘনাদাকেই যেন শিখিয়ে দেবার জন্যে বললে—হ্যাঁ, দশমিক এক, চার, একের পর পাঁচ, আট, দুই নিয়ে আরো অনেক সব সংখ্যা আছে।

দশমিক এক চার একের পর পাঁচ আট দুই নয়—ঘনাদা শুধু শিবুকেই যেন লক্ষ্য করে গড় গড় করে বলে গেলেন—পাঁচ নয় দুই নিয়ে অঙ্কের মিছিল আছে বলা যায়, যেমন পাঁচ নয় দুই-এর পর ছয় পাঁচ তিন···

ঘনাদা একটু থেমে আমাদের মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন—আরও শুনবে? ছয় পাঁচ তিনের পর পাঁচ আট নয়, তারপর সাত নয় তিন, তারপর দুই তিন আট চার ছয়···

আমাদের সকলের চোখই ছানাবড়া।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি—শিবুই তারই মধ্যে প্রথম অস্থির হয়ে উঠে ঘনাদাকে থামালে—কিন্তু দশমিকের লেজুড় যত লম্বাই হোক তা

দিয়ে পৃথিবীর ব্যাসকে গুণ করলে বড়জোর আঠত্রিশ হাজার কিলোমিটারের কিছু বেশী হলেও চল্লিশ হাজারে তো পৌঁছয় না। চল্লিশ হাজার কিলোমিটার শুনে তাই হাসছিলাম! সোজা অতদূর যেতে হলে তো এ পৃথিবীতে কুলোবে না।

তা কুলোবে না বটে!—ঘনাদা এবার শিবুর কথায় যেন বাধ্য হয়ে সায় দিয়ে বললেন—আরো বেশী দূর হলে তো নয়ই। আমার সে ধাঁধিকা আবার কমপক্ষে আট কোটি কিলোমিটার।

কত!—ভুল শুনেছি কি না জানবার জন্যেই বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করতে হল। আমাদের গলাগুলো সব তখন প্রায় ধরে এসেছে।

না, ভুল শুনি নি।

ঘনাদা স্পষ্ট স্বরেই সংখ্যাটা আবার জানালেন—আট কোটি কিলোমিটার।

॥ তিন ॥

দুবার ঘনাদার মুখে আট কোটি কিলোমিটার শোনবার পর আর কিছু বলতে হয়!

তক্তপোষের এধার-ওধারে যে যেখানে পারি তখন চেপে বসে গেছি। ব্লাডপ্রেসার সোম কাডিওগ্রাম সান্যাল আর ব্লাডটেস্ট গুপ্তও বাদ যায় নি।

আমাদের সকলেরই একরকম জায়গা হয়েছে, কিন্তু ঘনাদা? ঘনাদা বসবেন কোথায়? তাঁর কথা কি কেউ ভাবে নি?

যে ভাববার সে ঠিকই ভেবেছে।

আট কোটি কিলোমিটার শোনবার পরই গৌরকে আর যে দেখতে পাওয়া যায় নি সে খেয়াল আমাদের বিশেষ ছিল না।

এইবার সগর্বে তাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখা গেছে। সঙ্গে তার বনোয়ারী, আর দুজনের সযত্নে ধরে বয়ে আনা দোতালার আড্ডাঘরের সেই মার্কা-মারা আরাম-কেদারা, ঘনাদার যা মৌরসী।

এটা আবার বয়ে আনতে গেলে কেন?—কেদারাটা গৌর বেশ জুৎ করে পাতবার সময় ঘনাদা মৃদু একটু আপত্তি জানিয়েছেন, কিন্তু বসতে ত্রুটি করেন নি।

শিশির অবশ্য তার আগে থাকতেই এক পায়ে খাড়া। ঘনাদা আরাম কেদারায় কাৎ হতে না হতে হাতের টিনটা বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দিকে আর সিগারেটটা তিনি মুখে তোলার আগেই লাইটার জ্বেলে ধরতে এক সেকেণ্ড দেরী করে নি।

পূজোর ব্যবস্থা ষোড়শোপচারেই তৈরী। দোতালা থেকে শুধু আরাম কেদারাই আসে নি, নিচে রামভুজের কাছে হুকুম চলে গেছে। বনোয়ারী ওপর থেকে চেয়ার রেখে নামবা মাত্রই যেন ফুটন্ত কড়ায়

মাংসের সিঙাড়া ছাড়তে শুরু করে। ভাজা সিঙাড়ায় যতক্ষণ প্লেট বোঝাই হবে ততক্ষণে বনোয়ারী দুপুর থেকে এনে রাখা তোতাপুলি-গুলোও ছোট ডিশে সাজিয়ে ফেলবে।

এ-সব নৈবিদ্যি বাদে ধূপ-ধুনো হিসেবে শিশিরের সিগারেট জ্বালানো তো আগে থাকতেই শুরু হয়েছে।

এখন দেবতা শুধু প্রসন্ন হলেই হয়।

লক্ষণগুলো তখন শুভই মনে হচ্ছে।

ঘনাদা সিগারেটে ক্ষুদে ক্ষুদে টান থেকে একেবারে রামটানে পৌঁছে প্রায় মানোয়ারী জাহাজের মত ধোঁয়া ছাড়লেন।

আমরা কিন্তু তখন নিশ্বাসটা ছাড়তেও একটু দ্বিধা করছি, ঘনাদার আট কোটি কিলোমিটারের পাড়িটা পাছে ভেস্তে যায়।

আট কোটি কিলোমিটারের আশা দিয়ে ঘনাদা আজকের সন্ধ্যাটাও কি আমাদের পার করে দেবেন না?

এখন দরকার শুধু একটু লাগসই উস্কানির।

কেমন করে সেটা দেওয়া যাবে?

আমরা যখন ভেবে সারা, তখন ঘনাদাই তার মৌকা করে দেন।

প্রেসার, কার্ডিওগ্রাম আর ব্লাডটেস্টের সম্বন্ধে হঠাৎ যেন ভাবিত হয়ে উঠে বলেন—এঁদের সব ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দিলে! ডাকবার আগে একবার যদি আমায় জানাতে।

এমনি একটা সুযোগের জন্যেই ওৎ পেতে ছিলাম। পাওয়া মাত্র একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে বলি—আজ্ঞে আপনাকে জানাব কি! আমাদের কি তখন মাথার ঠিক আছে! এক হপ্তা আপনি দোতালায় নামেন নি!

তারপর রামভুজের মুখে শুনলাম, বুকের কি হয়েছে বলে এক বেলা মুরগীর আর একবেলা নলীর সুরুয়া খাচ্ছেন আর সব কিছুর সঙ্গে।

তাই ভয়ে দিশেহারা হয়ে যেখানে যাকে পেয়েছি সবরকম

পরীক্ষার জন্যে ডাকিয়ে এনেছি। তখন কি জানি যে আপনার নিজের কাছেই কাঠপোড়া ছাইয়ের ধন্বন্তরী আছে অমন !

আচ্ছা ওই কাঠ-পোড়া ছাই—রিলে রেসের মত আমি শিবু ও শিশির পর পর কথার খেই টেনে নিয়ে যাবার পর গৌর শেষ চালটা দেয়—ওটা আপনার সেই আট কোটি কিলোমিটারেই কাজে লেগেছিল বুঝি ?

তাইতেই বাজীমাৎ। আর ঠেলাঠেলির দরকার হয় না। চাকা আপনা-থেকেই গড়িয়ে চলে।

না। —ঘনাদাকে যেন একটু ভেবে নিয়ে বলতে হয়, তখনও পুরো আট কোটি হয় নি। হঠাৎ 'পাথর! পাথর! একটা পাহাড়ের চাঁই।' বলে চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম! সেই সঙ্গে টের পেলাম বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধড়ফড় করছে।

এ কি উত্তেজনায় ? নিজেকেই প্রশ্ন করলাম।

উত্তেজনা হওয়া তো আশ্চর্য কিছু নয়।

আটলাণ্টিকের মাত্র ছ'হাজার কিলোমিটার অজানায় পাড়ি দেবার পর সান সালভাডোর-এর প্রথম ডাঙা দেখে কলম্বস আর তাঁর নাবিকেরা যদি ধেই ধেই নৃত্য করে থাকেন, তাহলে আট কোটি কিলোমিটার মহাশূন্যে ছুটে এসে প্রথম ধরা-ছোঁয়ার মত কঠিন কিছু একটার খবর শুনে উত্তেজনা কি তার চেয়ে কম হবে ?

কিন্তু বুকের কষ্টটা যে শুধু উত্তেজনায় নয় তা বুঝতে দেরী হল না।

কোনরকমে টলতে টলতে জানালাটায় গিয়ে তখন দাঁড়িয়েছি।

সুরঞ্জন তখনও পাগলের মত হাত নেড়ে চিৎকার করছে, দেখেছেন ? ওই দেখুন কি প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাংড়া! পেয়েছেন দেখতে ?

দেখতে খুবই পেয়েছি।

হ্যাঁ, পাথরের চাংড়া হিসেবে প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু তা ছাড়া আর

কিছু তো নয়। মাপ যা মনে হল তাতে লম্বায় চওড়ায় বড় জোর পঁচিশ আর কুড়ি কিলোমিটার।

আমাদের যা বিপদ আর সমস্যা তা তো ওতে মিটবে না।

এইটুকু মাত্র আশা করা যায় যে অকূল সমুদ্রের জলে ফল-ভরা একটা গাছের ডাল ভাসতে দেখে কলম্বস যেমন কাছাকাছি ডাঙার আশ্বাস পেয়েছিলেন, এই পাথরের চাংড়ায় তেমনি শূন্যমার্গের কোন আশ্রয়ের ইঙ্গিত থাকতে পারে।

কিন্তু কোথায় সে আশ্রয়?

মহাশূন্যে প্রায় আট কিলোমিটার পার হয়ে কোথায় যে এসেছি কিছুই জানি না।

যার জানবার কথা সেই উন্মাদ লুটভিকের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই তো তাকে বাইরে রেখে এ কামরার দরজা এঁটে নিজেদের স্বেচ্ছাবন্দী হতে হয়েছে। সঙ্গীর মধ্যে আছে ওই সুরঞ্জন আর নেহাত গোবেচারী বটুকেশ্বর।

মহাশূন্যের এই অজানা বিস্তারে আশ্রয় নেবার মত জায়গা কি সত্যিই মেলা সম্ভব? আর মিললেও তাতে যে নামতে পারব, তার আশা কোথায়!

মোটা সাতপুরু কাঁচের জানালা দিয়ে পাথরের চাংড়াটা দেখতে দেখতে এসব ভাবনা ছাপিয়ে বুকের কষ্টটা ক্রমশঃ তখনও বাড়ছে।

একটু জল আনবার জন্যে সুরঞ্জনাকে বলতে গিয়ে দেখি বুকের ওপর হাত চেপে সে মেঝের ওপর বসে পড়েছে। কি হল কি? বলে কোনরকমে ডাক দিলাম—বটুক! বটুক!

কিন্তু সাড়া পেলাম না কারুর।

নিজেরই তখন মেঝেতে একটু নেমে বসলে আরাম হবে মনে হচ্ছে।

কিন্তু তার আগেই জ্ঞানটা লোপ পাবে নাকি! সেইরকম যেন লক্ষণ।

চমৎকার একটা সমাপ্তি! বসতে গিয়ে তখন ভাবছি, মহাশূন্যে পৃথিবী থেকে আট কোটি মাইল দূরে চারটি মানুষ। এমন করে বেঘোরে নিয়তি যাদের হিসেব চুকিয়ে দিতে যাচ্ছে, একজন তার মধ্যে লুটভিকের মত উন্মাদ বৈজ্ঞানিক, একজন সুরঞ্জনের মত গানের জগতের ভাবী দিকপাল, বটুকেশ্বরের মত একজন মুখ্যু-সুখ্যু গোবেচারা অনুচর, আর আমার মত একজন অকর্মণ্য অপদার্থ সর্বঘটের কাঁটালিকলা।

ঘনাদার মুখে এমন আত্মনিন্দা!

সকলে মিলে সরবে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আর তখন সময় নেই।

প্রতিবাদ তাঁর কানেও যেত কি না সন্দেহ।

তিনি তখন চোখ-কান সব সামনের ছাদের সিঁড়ির দিকে খাড়া করে বসে আছেন।

সেখানে হাতে প্রকাণ্ড ট্রে সমেত বনোয়ারীকে দেখা গেছে। তার পেছনে আর একটা ছোট ট্রে নিয়ে রামভুজ।

ঘরে এসে নামাবার পর জোড়া ট্রের রহস্য বোঝা গেল। একটিতে মাংসের সিঙাড়া, অন্যটিতে তোতাপুলি।

এসব আবার কেন হে?—ঘনাদা একটু যেন বৈরাগ্যের ভাব দেখালেন।

এমন একটা সুযোগ দিলে আর ছাড়া যায়।

আমি তাই বারণ করেছিলাম ওদের!—শিশির যেন আমাদের সকলের ওপর খাপ্পা হয়ে শোনালো—বলেছিলাম ঘনাদার হার্টের অসুখ। ওপর থেকে নিচে নামেন না, দুবেলা তাঁকে চাঙ্গা হতে সুরুয়া খেতে হচ্ছে, আর তাঁর জন্যে এই সব বিষের ব্যবস্থা করছিস! তাঁকে কি ওই মাংসের সিঙাড়া আর তোতাপুলি দিয়ে লোভ দেখাতে চাস? তিনি কি টলবার মানুষ?

যা, নিয়ে যা এসব ছাই-পাঁশ!—শেষ হুকুমটা বনোয়ারীকে—

আমাদের গুলো রেখে ওঁর জন্যে শুধু দুটো চিঁড়ে ভিজিয়ে নিয়ে আয়, আর তার যদি যোগাড় না থাকে তো দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট।

ঘনাদার মুখের দিকে চাইতেও তখন আর ভরসা হচ্ছে না।

তাঁর নিজের ফাঁদেই তাঁকে ফেলা হয়েছে, শুধু খেয়াল রাখতে হবে মাত্রাটা যেন না ছাড়ায়।

তাই ছাড়াবার উপক্রমই হল আমাদের ভাড়াটে সাজা ডাক্তারদের আহাম্মকীতে।

কার্ডিওগ্রাম সান্যাল দু' চোখ একেবারে কপালে তুললেন মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ দেখিয়ে।

বলিহারি আপনাদের আক্কেল! হার্টের রুগী, আর তার সামনে ওই বিষগুলো সিঙাড়ার নামে ধরে দিয়েছেন?

সরিয়ে নিয়ে যান ওসব ওঁর সামনে থেকে! ওই অন্যায় লোভ আর দেখাবেন না ওঁকে। —প্রেসার সোম হুকুম করলেন সরোষে।

ঘনাদার হাতটা তখন প্লেটের কাছে নামতে গিয়ে থমকে আছে। চোখে যেন দুর্যোগের লক্ষণ।

মাত্রা কি ছাড়িয়েই গেল নাকি?

তা যাক না। আমাদের মত কৌঁসুলী তাহলে আছে কি করতে! ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে আবার টেনে তুলে আবার ছাড়িয়ে আনা-ই তো আমাদের বাহাদুরী।

সেই বাহাদুরীই দেখাল শিবু।

হাত গুটিয়ে আছেন কেন ঘনাদা? খান আপনি!—শিবুর উদার উস্কানি।

ঘনাদাকে আর দুবার বলতে হয়! প্লেট থেকে একটা গোটা সিঙাড়া এর মধ্যেই তিনি যথাস্থানে প্রেরণ করেছেন। সত্যি কথা বলতে গেলে স্টপওয়াচ না থাকলে শিবুর মুখ থেকে প্ররোচনা খসা আর তাঁর নিজের মুখে সিঙাড়া প্রেরণ—কোনটা আগে তা নির্ণয় করা

সম্ভব নয়। আমাদের স্থূল চাক্ষুষ বিচারে প্ররোচনাটা প্রেরণের কাছে এক চুলের জন্যে মার খেয়েছে বলেই যেন লাগল।

ওদিকে সাজা ডাক্তাররা তখন একেবারে খাপ্পা।

আপনারা জেনে শুনে একটা মানুষকে খুন করছেন!

আপনাদের ক্রিমিন্যালি প্রসিকিউট করা উচিত।

ওঁকে ওই সিঙাড়া খাওয়ানোর মানে কি তা জানেন?

জানি।—গুরুগম্ভীর জবাবটা এবার শিবুর।

জানেন!—ব্লাডটেস্ট গুপ্তর তিক্ত বিদ্রূপ—কি জানেন?

জানি যে খাওয়া মানে হজম!—শিবু যেন গুরুমশাই।

হজম তো পেটে!—কার্ডিওগ্রাম সান্যাল যুক্তির সাঁড়াশী চালালেন —কিন্তু বুকে, মানে ওঁর হার্টে কি হতে পারে তা ভেবেছেন?

ভেবেছি। শিবুর মুরুব্বি চালে মোক্ষম জবাব—হার্টের কিচ্ছু হবে না। ওই কাঠ-পোড়া ছাই আছে কি করতে! ইচ্ছে করলে উনি একটা কেন পাঁচটা প্লেট সাবাড় করতে পারেন।

ঘনাদা শিবুর পরামর্শ আর কি করে ঠেলেন?

যথার্থই গুণে গুণে পাঁচটি প্লেট সাবাড় করবার পর যেন কর্তব্য-বোধে তোতাপুলির দিকে হাত বাড়ালেন।

তাঁর চোখে তখন যে ভাব দেখলাম তা কৃতজ্ঞতা যদি না হয় তাহলে তারই মাসতুতো-পিসতুতো কিছু। আমাদের আসর যে এর পর মালাই কুলফির মত জমবে এ বিষয়ে অন্ততঃ আর কোন সন্দেহ রইল না।

॥ চার ॥

আমাদের অনুমানের ভুল হয় নি। মাংসের সিঙাড়া-তোতাপুলিতে টঙের ঘরের আবহাওয়াই বদলে দিয়ে গেল!

কাঠ-পোড়া ছাইয়ের ভরসাতেই নিশ্চয়, অকুতোভয়ে কণ্ঠা পর্যন্ত বোঝাই করে ঘনাদা নিচে থেকে বয়ে আনা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু তা শুধু দু' মিনিটের জন্যে শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে ক'টি সুখটান দিয়ে যেন ভেতরের ষ্টীম তোলবার জন্যে।

সুখটান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে ধোঁয়ার কুণ্ডলী-তেই যেন পাকিয়ে ঘনাদা আট কোটি কিলোমিটার থেকে উপাখ্যানের রকেট একেবারে উপক্রমণিকায় টেনে এনে যেখানে নামলেন সেটা রাজস্থানের মরু বলেই মনে হল।

হ্যাঁ—ঘনাদা স্মরণশক্তিটা যেন ঠিকমত ফোকাস করে বললেন—দিল্লী থেকে আমেদাবাদ যাচ্ছিলাম। আচমকা এই অমন একটা বেয়াড়া জায়গায় বাধ্য হয়ে প্লেনটা নামাতে না হলে সুরঞ্জন আর বটুককে তাদের দলের কাছে ভালোয় ভালোয় আমেদাবাদে পৌঁছে দিয়ে আমি একটা বাংলার নাট্যকে দলের মান বাঁচাই। আমার জানা টহলদার এক নাট্যকে দল দিল্লী-আগ্রা হয়ে আমেদাবাদে গিয়েছিল নাটক দেখাবার বায়না নিয়ে। নাটক আবার কবিগুরুর 'রক্তকরবী' আর 'চিরকুমার সভা'। 'রক্তকরবীর রঞ্জন যে করবে সে নাকি পা ভেঙে হাসপাতালে। আর অক্ষয়ের পার্ট যার করবার কথা সে রিহার্সেলেই বেসুরো গেয়ে নিজে থেকেই হাওয়া। দিল্লীতে আমার কাছে তাই টেলিগ্রাম—যেমন করে হোক রঞ্জন আর অক্ষয়ের পার্ট নেবার মত হিরো পাঠান। নইলে বাংলার মান যায়।

বিপদটা বুঝলাম। কিন্তু কাকে পাঠাব? দেবব্রত, দ্বিজেন মুখুজ্যে, না সবিতাব্রত? উত্তমকুমার না সৌমিত্র? বড় গাইয়ে বা হিরো কি মুড়ি মুড়কির মত সস্তা! বড় তো দূরের কথা, ছোটখাটদেরও এখন পায়া কি কম ভারী! দেশ ছেড়ে আমেদাবাদে কারুর প্রক্সি দিতে যেতে তারা রাজী হবে কেন!

এমন সময় সুরঞ্জনের কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, সুরঞ্জন রাজী হলে একাধারে সব সমস্যা মিটে যায়। পেশাদার নয়, শৌখীন। সে একাই 'রক্তকরবী'র রঞ্জন আর 'চিরকুমার সভা'র অক্ষয় দুই-ই অনায়াসে চুটিয়ে চালিয়ে দিতে পারবে। যেমন চেহারা, তেমনি অভিনয়, তেমনি গানের গলা।

সুরঞ্জন—সুরঞ্জন সরকারের নাম কেউ নিশ্চয় এ কালে শোনে নি। শুনবে কোথা থেকে? এ দেশ তার প্রতিভার পরিচয় পাবার সুযোগই পেল কতটুকু? সে এ দেশে থাকলে এতদিনে নাটক সিনেমা সাহিত্য সবকিছুর সাপ্তাহিক-মাসিক-বার্ষিকগুলোর মলাট তারই একরকম একচেটে হয়ে থাকত।

সুরঞ্জনের কথা মনে হতেই তার হোটেলে ফোন করলাম। সুরঞ্জন ভাগ্যক্রমে তখন দিল্লীতে একটা ছোটখাট জলসায় গাইতে এসেছে!

আমার প্রস্তাব শুনে একটু দোনামোনা করে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল। তাকে অবশ্য অনেক করে বোঝাতে হয়েছিল। তাতেও কিছু হয়তো হত না। পয়সাওয়ালা বড় ঘরের ছেলে। গান বাজনা অভিনয় তার শখ। তাই বলে কোন টহলদার নাটুকে দলের গাইয়ে অভিনেতার প্রক্সি দেবার তার কি দায় পড়েছে!

শেষ পর্যন্ত এক যুক্তিতেই তাকে কাবু করতে পারলাম। বাংলা দেশ নয়, আলাদা প্রদেশ গুজরাট। সেখানে রবীন্দ্রনাথের নাটক গুবলেট হয়ে তাঁর নামের অমর্যাদা হওয়াটা কি ভাল হবে? তাঁর আর বঙ্গভূমির খাতিরেই যেমন করে হোক আমাদের এ দায় উদ্ধার

করে দেবার চেষ্টা করতেই হবে। শুধু তাকেই তো নয় আমাকেও কি বলে এককথায় দিল্লী ছেড়ে যেতে হচ্ছে তো!

আপনি তখন বুঝি দিল্লীতে থাকতেন? শিবু প্রশ্নটুকু বুঝি আর না করে পারলে না।

শিবুর ওপর ঘনাদা আজ একটু বেশী খুশি, নইলে বেফাঁস বাগড়া দেবার বেয়াদবীর ফল কি হত কে জানে!

ঘনাদা এককথায় মুখে হয়তো কুলুপই এঁটে দিতেন।

আজ কিন্তু তিনি ঈষৎ একটু হেসে শুধু বললেন—হ্যাঁ, তখন মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতে হত।

ঘনাদার মুখের দিকে চেয়ে তটস্থ হয়ে ছিলাম এতক্ষণ! তাঁর এ কথায় হাঁফ ছেড়ে শিবুকে ধমক দেওয়ার ছলে তাঁকে আমড়াগাছির আর কি কিছু বাকি রাখি।

গৌর শিবুকেই যেন একহাত নিলে—ঘনাদা দিল্লীতে থাকবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

ক্যাবিনেট ক্রাইসিস্-এর জন্যেই থাকতে হত নিশ্চয়।—আমি আর শিশির যেন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে নিলাম।

শুধু ক্যাবিনেট ক্রাইসিস্ কেন?—গৌর আমাদের সংশোধন করলে—ডিফেন্সের কোন পবলেম হলে ওঁকে ছাড়া ডাকবে কাকে?

ওসব কথা থাক না।—ঘনাদার যেন নিজের গৌরবের কথা বিনয়ে বাধল। তাই চাপা দিয়ে বললেন—সুরঞ্জন ওই যুক্তিতেই কাৎ হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী হল যেতে। কিন্তু একটি শর্ত। বটুক, মানে বটুকেশ্বরকে সঙ্গে নিতে হবে। বটুকেশ্বর হল সুরঞ্জনের খাস বাটলার বলতে যা বোঝায় তাই। সুরঞ্জনের খাওয়া-দাওয়া পোশাক-আশাক থেকে সবকিছু দেখা-শোনার ভার বটুকের ওপর। শুধু তাই নয়, বটুক সুরঞ্জনের গানের তবলচি, অভিনয়ের মেকআপ-ম্যান। বটুক বাদে সুরঞ্জনের সব কিছু অচল।

এ হেন বটুককে সঙ্গে নেব সে আর বেশি কথা কি! তখন যা

গরজ, সুরঞ্জন আবদার ধরলে অমন দশটা বুট্‌ককে নিতেও আপত্তি করতাম না।

দিল্লী থেকে আমেদাবাদে যাবার তখনও রেগুলার প্লেন-সার্ভিস হয় নি।

ভাড়াই করলাম তাই একটা ছোট প্লেন দিল্লী ফ্লাইং ক্লাব থেকে।

দেরি করবার সময় নেই। পাইলটের খুঁতখুঁতনি সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি সেই দিন দুপুরেই রওনা হলাম। কতক্ষণের বা মামলা। সোজা গেলে বড়জোর শ' বারো কিলোমিটার। খুব বেশি লাগে তো ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

পাইলট খুঁতখুঁত করেছিল ঝড়ের ভয়ে। বছরের এই সময়টার বিকেলের দিকে প্রায়ই নাকি ও অঞ্চলে বেশ দুরন্ত ঝড় ওঠে। আবহাওয়া অফিস থেকে সেদিন নাকি ওই রকম ঝড়ের পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে।

ওই পূর্বাভাস শুনেই মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল সব কেটে গেল।

হাওয়া অফিস বলেছে ঝড় হতে পারে!—পাইলটকে হেসে বললাম—তাহলে তো আর ভাবনাই নেই! বেপরোয়া হয়ে প্লেন ছাড়তে পার। ঝড় সম্বন্ধে আজকের দিন অন্ততঃ নিশ্চিন্ত।

হাওয়া অফিসের কথা সেইদিনই বেদবাক্য হয়ে উঠবে তা কি ভাবতে পেরেছি!

জয়পুর ছাড়াবার পরই সত্যি-সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখলাম মরুভূমির ঝড়! আকাশ বাতাস মাটি সব একাকার করে শুধু বালি ঝাপটা।

সে তো আর যন্ত্রে চালাবার অটোমেটিক কনট্রোলের হাত আমলের প্লেন নয়। সেকালের পাখা ঘোরানো হাল্কা প্লেন। চোখে দেখে চালাতে হয়।

প্রচণ্ড বালির ঝড়ে কানা করে কোথায় যে আমাদের নিয়ে চলল তা বোঝাই গেল না।

ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে করতে পাইলটের শুধু তখন চেষ্টা প্লেনটা নিচে আছড়ে না পড়ে।

সে চেষ্টা সফল হল। কিন্তু কোথায় যে প্লেনটা নামল তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না। ভারতবর্ষের মধ্যেই আছি, না ঝড়ের দাপটে পশ্চিম পাকিস্তানেই গিয়ে পড়েছি, তাও জানবার উপায় নেই।

এমন কিছু দূর নয়। একটু দিক-ভুল হয়ে থাকলে সে মুলুকে গিয়ে পড়ার খুবই সম্ভাবনা।

প্লেন কোনরকমে নামাতে পারলেও ঝড়ের হাত থেকে তখনও রেহাই নেই। প্লেন-শুদ্ধ আমাদের হাওয়ার বেগেই বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

॥ পাঁচ ॥

আমরা তিনজন কোনরকমে নামবার পর প্লেনটার সেই অবস্থাই হল। ঝড় তো দারুণ বেগে বইছে-ই, তার মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঝাপটা এসে পাইলট সমেত প্লেনটাকে যেন কাগজকুচির মত ঝেঁটিয়ে চোখের আড়াল করে দিলে।

নিজেরা তখন চোখ-মুখ চাদরে বেশ করে বেঁধে বালির ওপরই শুয়ে পড়েছি। ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায় তাই পরস্পরের হাতও ধরে আছি প্রাণপণে।

আশা এমনিতেই কিছু নেই। তবু তিনজনে একসঙ্গে থাকলে একটু যুঝতে অন্ততঃ পারব। ভরসাও কিছু পাব পরস্পরের কাছে থাকার দরুন।

কিন্তু সে ভরসা পেয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু লাভ হবে কি!

পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে থাকি বা না থাকি, থর মরুভূমির মধ্যে যে আমাদের প্লেন নেমেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ তখন নেই। আয়তনে না হোক ভীষণতায় এ মরুভূমিটি সাহারার চেয়ে কম যান না। তিনটে অসহায় নিঃসম্বল আর এ জগতের পক্ষে একান্ত আনাড়ি মানুষ শুধু হাত-ধরাধরি করেই এ মরুভূমি থেকে কি উদ্ধার পেতে পারে। আমাদের প্লেনটার তো কোন পাত্তা নেই। চেষ্টা করলেও আমাদের মত তিনটে প্রাণীকে এই ধু ধু শূন্যতায় খুঁজে বার করা পাইলটের পক্ষে অসম্ভব! সুতরাং যা কিছু নিজেদের চেষ্টাতেই করতে হবে। কিন্তু, উদ্ধার পেতে কোথায় কোন দিকে যাব!

ঝড়ের দাপটি ক্রমশঃ যখন কমে এল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। মরুভূমির শান্ত পরিষ্কার আবহাওয়ার রাত নয় যে আর কিছু না হোক আকাশের ঝকঝকে তারা দেখেই কিছুটা দিক-নির্ণয় করা যাবে।

চারিদিকে মরু-ঝড়ের রেশ রেখে —হাওয়া ঘোলাটে একটা বিশ্রী অন্ধকার। বালির ওপর থেকে উঠে বসে নিজেদেরই ভাল করে তখন দেখতে পাচ্ছি না।

তিনজনের মনেই তখন এক প্রশ্ন।

কিন্তু মুখ ফুটে কেউ আর কিছু বলছে না। বলে লাভও কিছু নেই। মনে মনে সবাই তখন জানি যে নেহাত অঘটন কিছু না ঘটলে আমাদের উদ্ধার পাবার কোন আশাই নেই। প্লেন থেকে কোনরকমে নামবার সময় নিজেদের জামা-কাপড়-জুতো আর বালির ঝাপটা সামলাবার জন্যে দুটো চাদর ছাড়া আর কিছু নিয়ে নামিনি। অন্য কিছু দূরে থাক, সকালে পর্যন্ত তেষ্টা মেটাব এমন একটা ফোঁটা জলও কাছে নেই।

সব কিছু এক হিসেবে আমারই দোষ। আমি শুধু এই আমেদাবাদ নিয়ে যাওয়ারই চক্রী নই, পাইলটের বারণ সত্ত্বেও ঝড়ের ভয় হেসে উড়িয়ে আজকের দিনে প্লেন ছাড়বার দুর্বুদ্ধিও আমার।

এই সব কিছুর জন্যে আমাকেই দায়ী করে সুরঞ্জন যদি আশ মিটিয়ে আমায় একহাত নিত, তাহলে সত্যিই আমার কিছু বলবার থাকত না।

কিন্তু ওই বিপদের মধ্যেও মুগ্ধ হলাম সুরঞ্জনের চরিত্রের মহত্ত্ব দেখে। আমার বিরুদ্ধে তো নয়ই, ভাগ্যের নাম করেও সুরঞ্জনকে একবার একটু হা-হুতাশ করতে শুনলাম না।

আর বটুকেশ্বর! বটুকেশ্বর যে কি জাতের মানুষ তা বোঝবার অবসর তখনও মেলে নি। সে রাত্রে তার অসীম স্থৈর্য ধৈর্য দেখেই আমি অবাক। সুরঞ্জনের পাশে আছে এই যেন তার যথেষ্ট। মরুভূমি না জলাবাদা, তাতে যেন তার কিছু আসে-যায় না।

মনের মধ্যে তখন একমাত্র আশা প্লেনটাকে জড়িয়ে।

পাইলটের পক্ষে প্লেন নিয়ে আমাদের খুঁজে বার করা প্রায়

অসম্ভব হলেও কাছাকাছি কোথাও এলে প্লেনটা আমাদের চোখে তো পড়তে পারে।

অনেকগুলো 'যদি' অবশ্য তার মধ্যে আছে।

প্লেনটা যদি চালাবার মত অবস্থায় থাকে, আমাদের কাছাকাছি যদি তা কোথাও থাকে, আর পাইলট নিজে যদি জখম না হয়ে থাকে।

এতগুলো 'যদি' একসঙ্গে মিলে যাওয়া অলৌকিক অঘটন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

অলৌকিক অঘটনই শেষ পর্যন্ত একটা ঘটল। কিন্তু ঘটল যে ভাবে তা কিন্তু আমরা কল্পনাও করতে পারি নি।

মরুভূমির যা দস্তুর, দিনের ফোস্কা-পড়া তাতের পর রাতের সেই কনকনে ঠাণ্ডা তখন পড়তে শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বালির ঝড়টার পর ঠাণ্ডাটা নামছে আর একটু তাড়াতাড়ি।

ঠাণ্ডায় তিনজনেই যখন ভেতরে ভেতরে একটু কাঁপতে শুরু করেছি, এমন সময় বটুকের গলা শুনে রীতিমত চমকে উঠলাম।

বটুকের গলার আওয়াজে চমকাবার মত কিছু অবশ্য নেই।

ঠাণ্ডার কাঁপুনি তার মধ্যে একটু আছে, কিন্তু বলার ধরনটা একেবারে যেন, 'চা হয়ে গেছে' কি 'অমুক বাবু এসেছেন' খবর দেওয়ার মত। তার মধ্যে আবেগ-উত্তেজনার বাষ্পও এক ছিটে ফোটা নেই।

চমকে উঠতে হল তার খবরটায়। নেহাত ঠাণ্ডা গলায় সে যা বলেছে তার তাৎপর্য যে দারুণ! কথাটা হল একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

আলো! আলো দেখা যাচ্ছে? কোথায় আলো!

উত্তেজনায় এক মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালাম। সুরঞ্জনও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ধীর-সুস্থে বটুকই উঠল সবশেষে।

ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে তখন তাকাচ্ছি।

কিন্তু কোথায় আলো ?

বটুকেশ্বরের পুরোপুরি পরিচয় তো তখনো পাইনি। বিপদে পড়ে মাথার গোলমাল হয়ে চোখে ধাঁধা দেখছে বলে সন্দেহ হল। ধমক দিলামও সেই জন্যে—কি আলো আলো বলছ! স্বপ্ন দেখছ নাকি!

না, না—সুরঞ্জনই প্রতিবাদ জানালে—বটুক যদি দেখে থাকে তাহলে ভুল দেখেনি। ওর একেবারে ঈগলপাখির চোখ। কই কোথায় আলো বটুক ?

ওই যে দেখা যাচ্ছে।

বটুক হাত বাড়িয়ে যে দিকটায় আঙুল দেখালে সেখানে আবছা ঘোলাটে অন্ধকার ছাড়া কিছুই তো দেখতে পেলাম না।

সুরঞ্জনের অবস্থাও বুঝলাম তাই। চোখের ওপর হাত রেখে যথাসাধ্য ঠাহর করবার বৃথা চেষ্টা করে সে জিজ্ঞাসা করল - আলোটা এখনও জ্বলছে, না নিভে গেছে ?

না নিভে তো যায় নি। - বটুকের সেই উচ্ছ্বাসহীন নিরুত্তাপ গলা,—একটা ঢিপি মতনের ভেতর থেকে জ্বলছে!

একে অদৃশ্য আলো, তার ওপর আবার ঢিবি! প্লেনটা হলেও বরং কথা ছিল। ঢিবি এখানে কোথা থেকে আসবে!

আজগুবি খবরের জন্যে এবার বেশ রেগেই তাই ধমকে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই দেখি সুরঞ্জন বটুককে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

এদের দুজনেরই মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি একসঙ্গে ? বটুক অন্ধকারে খোয়াব দেখে বলেছে ঢিবির আলো, আর সুরঞ্জন তার কথাতেই অন্ধের মত ছুটছে!

আবার ডেকে তাদের থামাবার চেষ্টা করলাম। সে ডাক তাদের কানেই গেল না বোধ হয়।

বাধ্য হয়ে তাই তাদের পেছনেই যেতে হল। এই অজানা ধু-ধু

মরুতে রাতের অন্ধকারে ছাড়াছাড়ি হতে তো কিছুতেই দেওয়া যায় না। ক্ষেপেই যাক আর যাই হোক, তাদের সঙ্গেই থাকতে হবে।

সঙ্গে থাকলেও অবস্থা শেষ পর্যন্ত যা হবে তা তখন বুঝতে আর বাকি নেই। ওই মরুর মধ্যেই ক'জনের হাড়গুলো যে বছরের পর বছর শুকোবে, কল্পনায় তা তখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ওই ধু-ধু অজানা বালির মরুতে সুরঞ্জন আর বটুকের মত দুজনকে আমার সঙ্গে একত্র করার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়তিরই যে অমন একটা অভিপ্রায় আছে তা কি তখন ভাবতে পেরেছি!

মরুভূমির মধ্যে আমাদের হারিয়ে যাওয়া যে ভবিষ্যতের একটা আভাস, তাই বা তখন কেমন করে বুঝব!

কত বড় অঘটন যে ঘটতে যাচ্ছে আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কল্পনা করতে পারে নি।

বটুক আর সুরঞ্জনের পেছনে কিছু দূর পর্যন্ত যাওয়ার পর সত্যি সত্যিই এবার নিজের চোখে দূরে একটা বালির ঢিবি, আর তারই একটা ফাঁক থেকে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখে তখন শুধু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

ওই ঢিবির কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে অঘটন যা ঘটবার তা অবশ্য ঘটে গেছে।

আমরাই শুধু বুঝতে পারিনি।

বুঝতে পারিনি যে আর মাত্র ঘণ্টা দুয়েক বাদে এমন এক অভিজ্ঞতার ভাগীদার হতে যাচ্ছি, পৃথিবীর মানুষের যা কল্পনারও বাইরে।

॥ ছয় ॥

দূরের ঢিবির আলোর রেখাটার দিকে চেয়ে তিনজনে তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

পাকিস্তান বা ভারত যার সীমানার মধ্যেই পড়ুক, থর-এর এই মরুভূমির মাঝে মাথায় আলো জ্বলবার মত ওরকম একটা ঢিবি কেমন করে থাকতে পারে!

আলোটা আবার সাধারণ টিম-টিম কেরাসিন কি তেলের আলো তো নয়। বালি ঝড়ের ঘোলাটে অন্ধকারে একটু অস্পষ্ট দেখালেও আলোটা যে বিদ্যুৎ বা তার চেয়ে জোরালো কিছুর তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ঢিবি আর আলোর রহস্য যাই হোক, আমাদের তখন আর অপেক্ষা করবার উপায় নেই!

মরুর ঝড়টা এতক্ষণ একটু থেমে ছিল, তা আবার তখন বাড়তে শুরু করেছে!

বালিগুলো ছুঁচের মত গায়ে তো ফুটছেই, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডাও যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীর।

ও ঢিবিটা যাই হোক, ওরকম জোরালো আলো মানেই সভ্যতা। ওখানে এখানকার মত আশ্রয় তো পাওয়া যাবে।

সেই দিকেই তাই যতদূর তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ঢিবিটার তলায় গিয়ে পৌঁছে যেমন হতভম্ব তেমনি হতাশ হতে হল।

ঢিবিটা খুব ছোটখাট নয়। নেহাত বালির না হলে মনে করা যেত যে লম্বা খাড়া একটা পাহাড়ের টুকরোই যেন সেখানে বসানো আছে। ওরকম জায়গায় একেবারে অসম্ভব, নইলে বালির ঢিবির মধ্যে লুকানো একটা কুতুব মিনার গোছের কিছুও ভাবা যেত।

কিন্তু ওরকম একটা পাহাড়ের টুকরো কি বালিতে পোঁতা পুরনো মিনারের ধ্বংসাবশেষ হলে, তার মাথায় অমন জোরালো আলো কোথা থেকে জ্বলতে পারে !

আর জোরালো আলো যার মাথায় জ্বলছে সে ঢিবির ভেতর ঢোকবার কোন রাস্তা নেই কেন ? চারিদিকেই তো শুধু নিরেট বালির গা !

ব্যাপারটা কি ভুতুড়ে কিছু ?

না, সারাদিনের ধকলে আর পিপাসায় আমাদেরই আর মাথার ঠিক নেই ?

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি !

কিন্তু জেগে স্বপ্ন দেখলে সবাই মিলে কি এক স্বপ্ন দেখে !

তা ছাড়া বালির ঝড় আবার শুরু হবার সঙ্গে হাওয়ার ঝাপটায় বালিগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে যে রকম ঠাণ্ডা ছুঁচের মত গায়ের মধ্যে ফুটছে, যে-কোন বেঘোর অবস্থা কাটিয়ে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

না, স্বপ্ন নয়, ভুতুড়ে কোন ব্যাপার নয়, একেবারে বাস্তব সত্য। শুধু তার মানেটা একেবারে বোঝা যাচ্ছে না।

বালির ঝড় থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়ার জন্যে ঢিবিটাকেই আড়াল করে তার যে দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সে দিকে থাকাও হঠাৎ বিপজ্জনক বলে মনে হল।

ঝড়ে নাড়া খেয়েই তার ওপর থেকে আগে থেকেই ঝুর ঝুর করে বালি ঝরে পড়ছিল। সেটা গায়ের মধ্যে আনি নি।

তারপর হঠাৎ বেশ এক বড় একটা চাংড়া ওপর থেকে খসে পড়ায় সভয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে যেতে হল।

বালির চাংড়াটা আর একটু হলে মাথার ওপরই পড়েছিল।

কিন্তু তারপর এটা কি আশ্চর্য ব্যাপার !

ঢিবিটার ভেতর থেকে যেন ক্ষীণ একটু আলো দেখা যাচ্ছে !

দেখতে দেখতে সে আলো একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঢিবির

বালি এক জায়গায় খসে গিয়ে একটা যেন ছোট ফোকর দেখা যাচ্ছে। আলোটা আসছে সেই ফোকর থেকেই।

ফোকরের আলোটার দিকে চেয়ে আমরা যখন প্রায় সম্মোহিত হয়ে গিয়েছি তখন ঢিবিটার ওপর থেকে আরো কয়েকটা চাংড়া আর বেশ কিছু বালি খসে পড়ল! অবশ্য তখন নিজেরাই দূরে সরে আছি।

তারপরই অবাক হয়ে দেখলাম ছোট ফোকরটা বড় হতে হতে ক্রমশঃ যেন একটা বড় গহ্বর হয়ে উঠছে।

ফোকরের আলোটা আর কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। আলোটা না থাকার দরুণ গহ্বরটা কেমন একটা অন্ধকার জন্তুর মুখের হাঁ-র মত দেখাচ্ছে।

ব্যাপারটা তখন বোঝবার চেষ্টা করছি।

বালির ঢিবির এটা কি একটা স্বাভাবিক গহ্বর? ঝড়ের ঘায়ে ওপরের বালির চাংড়া খসে পড়ার পর আপনা থেকে কি এটার চেহারা বেরিয়ে পড়েছে?

আলোটা যা দেখেছি সেটা তাহলে কি? ঢিবির মাথায় যে অদ্ভুত আলো দেখে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছি, ফোকরের আলোটার তাই যদি উৎস হয়, তাহলে ঢিবিটা তো আগাগোড়া সেই মাথা পর্যন্ত ফাঁপা?

এরকম কোন বালির ঢিবি মরুভূমির মধ্যে থাকা কি সম্ভব?

সম্ভব অসম্ভব যাই হোক, তখন আর তা নিয়ে বেশী কিছু ভাববার সময় নয়।

বালির ঝড়টা আমাদের সামান্য একটু আড়ালের সুযোগ পেতে দেখে যেন আরো হিংস্র হয়ে উঠল। যেমন তার প্রচণ্ড বেগ, তেমনি তার হাড়-কাঁপানো শীত।

সাত-পাঁচ ভেবে সামনের ওই গহ্বরের আশ্রয়টুকু আর উপেক্ষা করা গেল না।

তিনজনে পর পর সেই গহ্বরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

ভয়ে ভয়েই ঢুকেছিলাম, কিন্তু মিনিট-খানেকের মধ্যেই ভয় ছাপিয়ে একটা সন্দিগ্ধ কৌতূহলই বড় হয়ে উঠল।

এ কি রকম গহ্বর?



বাইরে থেকে যা মনে হচ্ছিল ভেতরের জায়গাটা তার চেয়ে অনেক বড় মনে হল। একেবারে গাঢ় অন্ধকার হওয়ার দরুণ মাথার ওপরটা কত উঁচু আর চার পাশে কতখানি ছড়ানো তা ঠিক বুঝতে না পারলেও একটা ছোটখাট থিয়েটার-হলের মত জায়গায় যে ঢুকেছি সে বিষয়ে তখন আর সন্দেহ নেই।

অন্য কিছুর বদলে থিয়েটার-হলের সঙ্গে মিলের কথাটা কেন যে মনে হয়েছিল কে জানে! নিজের অজান্তে মন কি ভবিষ্যতের কিছু আভাসই তখন পেয়েছিল!

কারণ এর পর থেকে যা শুরু হল, চমকদার যে-কোন আজগুবী নাটককে তা ছাপিয়ে যায়।

প্রথমেই নাটক করলে বটুক।

হঠাৎ মেঝেতে একটু পা ঘষে তার মার্কা-মারা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললে—খাঁচাটা কাঁপছে।

কি কাঁপছে? —সুরঞ্জন যেমন উদ্বিগ্ন তেমনি একটু বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

খাঁচা আবার কোথা থেকে এল? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

আমরা তো খাঁচার মধ্যেই আছি।—বটুক যেন বিছানায় শুয়ে থাকার খবরের মত জানিয়ে বললে—ঝাঁপটা'ত বন্ধ হয়ে গেছে।

ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে!—আমিই এবার সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম—ঝাঁপ মানে যেখান দিয়ে এ গহ্বরে ঢুকেছি সেখানকার কোন দরজার কথা বলছ?

হ্যাঁ, তবে দরজা নয়, ঝাঁপ!—বটুক নিজের কথাটাই ধরে রইল—আমরা ঢোকবার পরই ওপর থেকে নেমে বন্ধ হয়ে গেছে, আর সমস্ত খাঁচাটা এখন কাঁপছে।

কম্পনটা তখন আমরাও টের পেয়েছি। কিন্তু বটুকের 'খাঁচা' কথাটা ব্যবহারের কোন মানে পাইনি। এ কাঁপা তুফানের দাপটের কি ভূমিকম্পেরও হতে পারে কি না বিচার করতে গিয়েই দ্বিতীয় নাটকীয় বিস্ময়।

হঠাৎ গহ্বরটা আলোয় আলো হয়ে গিয়েছে। আর তারই মধ্যে ওপর থেকে নেমে আসা একটা লোহার হেলানো সিঁড়িতে একটি অদ্ভুত মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

মূর্তিটি যদি অদ্ভুত হয়, তার প্রথম সম্ভাষণটা তার চেয়েও বেশি।

শীর্ণ হাড়-বেরনো মুখে একটা শয়তানী হাসি নিয়ে সে বলেছে তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি।

বলে কি মানুষটা আমরা তো সবাই তাজ্জব!

সব কিছুই যে আজগুবি সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।

ধূ ধূ মরুভূমির মাঝখানে একেশ্বর এক বিরাট বালির ঢিবি।



সে বালির ঢিবির মাথায় এমন আলো যে মরুর ঝড়ের ভেতরও দূরদূরান্ত থেকে দেখা যায়।

বালির ঢিবি আবার ফোঁপরা। তার ভেতর ঢোকবার পর তা যেন বিরাট অন্ধকার এক খাঁচা হয়ে ওঠে। যেখান দিয়ে তাতে ঢুকেছি

সেখানে একটা ঝাঁপ পড়েই যেন বন্ধ হয়ে যায়, আর খাঁচার মত গহ্বরটা হঠাৎ কাঁপতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আলোয় আলো হয়ে কোথা থেকে এক অদ্ভুত মূর্তি এসে দেখা দিয়ে বলে কি না - তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি!

মানুষটা কি পাগল নাকি?

তা না হলে কি মানে ওই অদ্ভুত কথার?

যে বলেছে সে লোকটাই বা কে? আমাদের জন্যেই বা অপেক্ষা করছে কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য শেষ পর্যন্ত মিলেছে, কিন্তু যখন তা পেলাম তখন এমন এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারের নিরুপায় ভাগীদার হয়েছি যে নিয়তি বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর করবার কিছু নেই।

॥ সাত ॥

কি বা করবার থাকতে পারে চিরকালের চেনা-জানা তুনিয়ার সঙ্গে একেবারে সব সম্পর্ক চুকিয়ে তু' চার হাজার নয় অমন তু' চার কোটি কিলোমিটার ভেসে ভেসেই ছাড়িয়ে যেতে যেতে!

হ্যাঁ, ক'দিন তাই তখন আমাদের অবস্থা।

অনেক কিছু তার মধ্যেই জানতে পেরেছি।

জেনেছি যে ফোঁপরা ঢিবির খাঁচায় বন্দী হবার পর অদ্ভুত যে মানুষটার প্রথম দেখা পেয়েছিলাম, মিথ্যা সে কিছু বলে নি।

সত্যিই আমাদের অপেক্ষাতেই সে ছিল! আমাদের মানে, একেবারে নাম ধরে স্বরঞ্জন 'ঘনশ্যাম, বটুকেশ্বরের নয়, মানুষ হিসেবে যে-কেউ আসে তার।

কেন? কি তার মতলব? কে সে?

তাও জেনেছি। সে নিজেই বড়াই করে সব শুনিয়েছে, কিন্তু আমাদের জান-প্রাণের চাবিকাঠি যে তার হাতে সে কথাটা ভাল করে বোঝবার আগে নয়।

ঢিপির ফোঁপরা গহ্বরটা তখন বেশ বিশ্রী ভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম সেখানকার ফাঁকটা ঝাঁপের মত একটা কিছু পড়ে তখন বন্ধ।

এ সব থেকে তখন বুঝতে পারছিলাম যে বাইরে যেটার বালির ঢিবির মত চেহারা, আসলে সেটা কোনরকম একটা ধাতুর তৈরি বিরাট আশ্রয় গোছের।

মরুভূমির মাঝখানে এরকম একটা আস্তানা বানাবার কি উদ্দেশ্য তা অবশ্য তখন ধরতে পারিনি। মরু সম্পর্কে কোনরকম বৈজ্ঞানিক গবেষণাই উদ্দেশ্য বলে মনে হয়েছে।

খাঁচার মত আস্তানাটার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে সেটা অমন বিশ্রী ভাবে কাঁপতে শুরু করায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ হয়েছে।

আমার চেয়ে সুরঞ্জনেরই বেশি। লোহার সিঁড়িতে দাঁড়ানো অদ্ভুত মূর্তিটাকে তাই সে প্রথমেই প্রশ্ন করেছে—আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কেন? কে আপনি?

আমি। সুঁটকো লোকটা অদ্ভুত ভাবে হেসে বলেছে, আমাকে সারেং বলতে পার, আর তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি সওয়ারী দরকার বলে।

সারেং, সওয়ারী—লোকটা এসব বলছে কি? লোকটার চেহারায় চোখের দৃষ্টিতে একটা পাগলাটে ছাপ কিন্তু আছে।

একটু কড়া গলাতেই তাই জিজ্ঞাসা করেছি, কিসের সারেং তুমি?

আমাদের সওয়ারী বলছ কেন?

কেন বলছি দেখবে?

এবার সত্যিই পাগলের হাসি হেসে উঠেছে লোকটা। তারপর লোহার সিঁড়িটা দিয়ে একটু ওপরে উঠে—কোথায় একটা বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে দেখেছি আমাদের খাঁচার মত আশ্রয়টার একটা দিকের গোল দেওয়াল আপনা থেকেই সরে গিয়ে বিরাট একটা জানলা গোছের বেরিয়ে পড়ছে।

কিন্তু জানালার বাইরে ও কি দেখা যাচ্ছে?

আকাশ তো পরিষ্কার। ঝলমল করছে তার মধ্যে তারাগুলো।

বালির ঝড় তাহলে থেমে গেছে? ঝড়ে আকাশটার এক রকম ঝাড়-পোঁছ হয়ে গেছে বলেই বোধ হয় তারাগুলো অত বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

কিন্তু তারাগুলো মিট মিট করছে না কেন?

ব্যাপারটা চোখে পড়লেও তার সঠিক তাৎপর্যটা তখনো বুঝিনি।

বুঝতে অবশ্য দেরি হল না। যার মধ্যে আছি সেই রহস্যময়

আশ্রয়টার অদ্ভুত কাঁপুনি তখন আশ্চর্য ভাবে থেমে গেছে। কিন্তু সব কিছু ব্যাপার মিলে আমাদের অস্বস্তি আর উদ্বেগ দিয়েছে বাড়িয়ে।

সুরঞ্জন তাই তার মনের কথাটা জোর গলাতেই জানিয়ে দিলে। বললে—সওয়ারী টওয়ারী আমরা হতে চাই না। আকাশ দেখে তো বুঝছি বাইরের ঝড় থেমে গেছে। দরজা খুলিয়ে দিন, আমরা বেরিয়ে যাব।

বেরিয়ে যাবে? লোকটার আবার সেই শয়তানী হাসি—বেশ, যাও। তবে একটু লাফ দিতে হবে। পারবে?

লাফ দিতে হবে! এবার আমিই সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

তা না হলে নামবে কি করে?—বাচ্চাদের সঙ্গে যেন তামাশা করার ধরনে লোকটা বললে—বেশি কিছু নয়। এখন হাজার বিশ কিলোমিটার লাফ দিলেই চলবে।

বিশ হাজার কিলোমিটার!

শুধু সন্দিগ্ধ আর নয়। রীতিমত ভীত হয়েই জানলাটার দিকে ছুটে গেলাম।

খোলা বলে যা মনে হচ্ছিল সে জানলা দেখলাম বন্ধ, তবে কাঁচের চেয়ে স্বচ্ছ এমন কিছু জিনিসে যা হাতে না ছুঁলে কাছে থেকেও বোঝা যায় না।

তারাগুলোকে ঝিকমিক করতে না দেখে ক্ষীণ যে সন্দেহটুকু মনে জেগেছিল আর নেহাৎ আজগুবী ভেবে যে ধারণাকে আমল দিই নি, স্তম্ভিত হয়ে বুঝলাম তা-ই সম্পূর্ণ সত্য।

জানলার কাছে ছুটে আসার সময়ই অবশ্য ব্যাপারটার আভাস পাওয়া উচিত ছিল।

ছুটতে গিয়ে আধা-ভাসমান অবস্থাতেই সবেগে জানলাটার কাছে পৌঁচেছি। দু' হাত বাড়িয়ে দেয়ালে না ভর দিলে মাথাটাই ঠুকে যেত।

উত্তেজনাও উদ্বেগে ব্যাপারটা তখন তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নি।

এখন জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্যের সঙ্গে অন্য সব কিছু মিলিয়ে হতাশ হয়ে বুঝলাম, যেখানে ছিলাম থরের সেই মরুতে তো নয়ই, পৃথিবীরই কোথাও নামবার আর আমাদের উপায় নেই।

পৃথিবীকে বহুদূরে পেছনে ফেলে আমরা মহাশূন্যে ভেসে চলেছি।

ওই উন্মাদ লোকটা যা বলেছে, পৃথিবী ক্রমশঃ প্রতি মুহূর্তে সেই বিশ হাজার কিলোমিটারের থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে।

বিস্ময়ে যেমন হতভম্ব, নিজেদের নিরুপায় অবস্থায় তেমনি হতাশ হয়ে উন্মাদ চেহারার লোকটার দিকে এবার ফিরেছি।

লোকটা তখন আমাদের অবস্থা দেখে মিট মিট করে হাসছে।

চেহারা যার উন্মাদের মত, লোকটা সত্যি কি তাই ?

উন্মাদ হলে এমন অবিশ্বাস্য আশ্চর্য একটা ব্যাপার সে কি সম্ভব করে তুলতে পারে ?

পরে বুঝেছি যে উন্মাদ বলেই সে তা পেরেছে।

নাম অ্যালজার লুটভিক্। পৃথিবীর কোন দেশের বৈজ্ঞানিকদের তালিকায় তার নাম কিন্তু পাবে না।

তবে কোথা থেকে সে উদয় হল ? লুটভিক্ কি ভুঁইফোঁড় ?

না, নানা দেশে নানা নামে বহুকাল ধরে সে তার গবেষণা চালিয়ে এসেছে। তার আসল কাজ আর উদ্দেশ্য কাউকে বুঝতে না দেবার জন্যেই এই চালাকি।

সব গবেষণা শেষ করবার পর তার অবিশ্বাস্য পরীক্ষা চালাবার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে থরের এই মরুভূমি।

মরুভূমিই তার দরকার ছিল। কিন্তু পৃথিবীর অন্য সব জায়গায় বিঘ্ন হবার ভয় অনেক বেশী। সাহারায় তখনও ফরাসীদের দাপট। তারা নিজেরাই সেখানে পারমাণবিক পরীক্ষা-টরিক্ষা চালাচ্ছে। সুতরাং সেখানে নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে কাজ করা যাবে না।

টাকলা মাকানেও তাই। সেখানে চীনের নজর এড়িয়ে কিছু

করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে ভাল মনে হয়েছে থরের মরুর এই অঞ্চলটা। একদিকে ভারত, একদিকে পাকিস্তান। মাঝখানে খানিকটা প্রায় বেওয়ারিশ নো-ম্যান্‌স্‌-ল্যাণ্ড। একেবারে নিস্ফলা ধু ধু মরু বলে কারুর এ জায়গা নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই।

লুটভিক্ তাই নির্ঝঞ্ঝাটে এখানে তার আস্তানা গেড়েছে। সরকারের তরফ থেকে সামান্য খোঁজ খবর যা হয়েছে তার মুখ চাপা দিয়েছে জ্যোতির্বিদ্যার মানমন্দির বসাবার জায়গা খোঁজার অজুহাত দিয়ে। অবিশ্বাসের কিছু নেই। মহাশূন্যের দূরবীন বসাবার মানমন্দিরের জন্যে নির্মেঘ শুকনো এমনি মরু-অঞ্চলই সত্যি লাগে।

লুটভিক্ বড়াই করে নিজেই নিজের এসব কীর্তি শুনিয়েছে।

এ বিবরণে তার ধূর্ত বুদ্ধির পরিচয় থাকলেও সে যে অমানুষিক অপ্রকৃতিস্থ কিছু, এমন কোন আভাষ পাওয়া যায় নি।

সুরঞ্জনের পরের প্রশ্নের জবাবেই লুটভিকের সেই ভয়ঙ্কর রূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

লুটভিকের বাহাদুরীর ইতিহাস শুনতে শুনতে সুরঞ্জন স্বাভাবিক কৌতুহলেই জিজ্ঞাসা করেছে—বুঝলাম, আপনি মস্ত একজন বৈজ্ঞানিক. যা এখানে গড়ে তুলেছেন তা আশ্চর্য এক মহাকাশযান। কিন্তু এতে আমাদের সওয়ারী নেবার আপনার কি দরকার ছিল?

কি দরকার ছিল?—লুটভিকের সেই শয়তানী হাসি আবার তখন শুরু হয়েছে—ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগ কি সাদা ইঁদুরের কি দরকার থাকে? ইচ্ছে করলে জন্তু-জানোয়ারও নিতে পারতাম, কিন্তু তার চেয়ে মানুষই ভাল মনে হল।

আমাদের আপনি আপনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় গিনিপিগের মত ব্যবহার করবার জন্যে সঙ্গে নিয়েছেন?—আমাদের সকলের স্তম্ভিত প্রশ্নটাই সুরঞ্জনের মুখ দিয়ে বার হল।—কি করবেন আমাদের দিয়ে?

যাই করি না—লুটভিক্ আমাদের যেন লোভ দেখিয়ে আশ্বাস দিলে, খাওয়া-দাওয়া থেকে আরামে থাকার ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হবে না। উপরি হিসেবে এই আশ্চর্য শূন্য-প্রয়াণ তো আছেই। মিছে বাজে ভাবনা ভেবে তো লাভ নেই। বিজ্ঞানের জন্যেই নিজেদের উৎসর্গ করছ জেনে এখন খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম কর। এখানে সবরকম ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছে করলে ওই জানলা দিয়ে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের শোভাও দেখতে পার।

শেষ একটা নিষ্ঠুর শয়তানী হাসি হেসে লুটভিক্ আমাদের কামরার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যখন চলে গেল তখন আমরা সবাই বোবা হয়ে গেছি। ভয়ে-ভাবনায় হতবুদ্ধি হয়ে আমাদের জিভগুলোও তখন আড়ষ্ট।

॥ আট ॥

লুটভিক্ যা বলে গেছে তা মিথ্যে নয়। শূন্যযানের যে অংশটায় ছোটখাটো একটা হলের মত কামরায় আমরা আছি, খাবার-দাবার থেকে সাধারণ দরকারী কোন জিনিসের সেখানে অভাব নেই। নিচে প্রথম ঢোকার সেই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার পর লুটভিক্ নিজেই আমাদের এ কামরায় নিয়ে এসেছে। উঠে এসে কামরায় জায়গা পাবার পর লুটভিকের শূন্যযানটা যে নেহাত ছোটখাট নয় তা বুঝতে পেরেছি।

এত বিরাট একটা শূন্যযান কিসের শক্তিতে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে তা অবশ্য বুঝতে পারি নি। সামান্য একটা রকেটকে পৃথিবী ছাড়িয়ে পাঠাবার আর ফেরত আনবারই কত ঝামেলা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পার হয়ে আসা-যাওয়া করতেই তো তার শুধু হাওয়ার ঘর্ষণেই পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার বিপদ। কত কাণ্ড করে সে বিপদ সামলাতে হয়!

আর এ শূন্যযান পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে যে চলে এল, মাধ্যাকর্ষণের অভাবে ক্রমশঃ পালকের মত হাল্কা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন অসুবিধাই তো টের পেলাম না!

এ রহস্য নিয়ে এত সব ভাবনা তখন কিন্তু ভাববার সময় হয় নি।

আমরা যে তার পরীক্ষার গিনিপিগমাত্র তা জানিয়ে লুটভিক্ চলে যাবার পর এই উন্মাদের হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পাওয়া যায় সেইটেই তখন একমাত্র ভাবনা হয়ে উঠেছে।

যেটুকু পরিচয় এই কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়েছি, তাতে এই উন্মাদ পিশাচকে কোন বিশ্বাস নেই। বিজ্ঞানের নামে সে আমাদের নিয়ে অকাতরে এমন কিছু করতে পারে যার পরিণাম হয়তো মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর।

তাকে যেমন করে হোক তাই না ঠেকালে নয়।

কিন্তু উপায়টা কি!

শুধু টুঁটিটা একটু টিপে ধরলেই হয়।—বটুকেশ্বর তার যেন মুখস্থ-পড়া-বলার গলায় বললে—ও শুঁটকো মুরগীর জান আর কতটুকু।

না।—আপত্তি করলে সুরঞ্জন—এ শূন্যযান কি বস্তু, আমরা কিছুই জানি না। এটা চালাবার জন্যেই ওর টিকে থাকা দরকার। নইলে এই তেশূন্যে আমরা করব কি? ওকে তাই ওর কণ্ট্রোল রুমে বন্দী রাখাই ভাল।

উঁহুঁ—আমি মাথা নাড়ালাম—শুধু কণ্ট্রোল রুমে বন্দী করে রাখলে সমস্যা মিটবে না। এ শূন্যযান চালাবার জন্য কোথাও কিছু দরকারী কলকব্জা থাকতেও পারে। কণ্ট্রোল রুমে বন্দী থাকলে লুটভিক্ সে সবের নাগাল পাবে না। ওকে তাই ছেড়ে রাখতেই হবে।

তাহলে ওর হাত থেকে বাঁচবার উপায়?

উপায় আমাদের নিজেদের বন্দী করা!

নিজেদের বন্দী করা?—অবাক হয়ে বললে সুরঞ্জন—সে আবার কি রকম?

সেটাই হল সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা—ওদের বুঝিয়ে দিলাম—এই কামরাটার সাজ-সরঞ্জাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা আমাদের ওর শয়তানী পরীক্ষার গিনিপিগ রাখবার মত করেই তৈরী। তাই আর যেখানে থাক, এ কামরায় শূন্যযানের কোন দরকারী কলকব্জা ও রাখেনি বলেই আমার বিশ্বাস। আমরা নিজেরা এ কামরা ভেতর থেকে বন্ধ করে নিজেদের বন্দী করে রাখলে ওর শূন্য-যান চালাবার কোন অসুবিধা হবে না, অথচ আমরাও ওর নাগালের বাইরে থাকব। অবশ্য দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এ কামরায় ঢোকার কোন গোপন উপায় যদি থাকে তাহলে আমরা নাচার।

হতাশার আশা হিসেবে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ রাখবার ব্যবস্থাই তারপর করা হল।

ব্যবস্থা আর কি? কামরার ভেতরকার চেয়ার-টেবিল গোছের কিছু আসবাবপত্র এনে দরজায় ঠেকা দেওয়া। আমাদের ভাগ্যে লুটভিক্ মানুষটা নেহাত স্থঁটকো ডুবলা পাতলা হাড্ডিসার। শূন্যযানে ভার বলে কিছু না থাকলেও তার মত তালপাতার সেপাইয়ের পক্ষে দরজার ওসব ঠেকো ঠেলার জোরে ভেঙে ঢোকা সম্ভব নয়।

দরজাটা বন্ধ করবার সময়ও শূন্যযানের ভেতরকার মামুলী ব্যবস্থায় বেশ অবাক হতে হয়েছে। এমন আশ্চর্য একটা যন্ত্রযান এমন সব সাধারণ আসবাবপত্র নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে কি করে?

উত্তরটা তখনও পাই নি, তবে নিজেদের বন্দী করার বুদ্ধিটা সফলই হয়েছে।

দরজার বাইরে লুটভিকের আস্ফালন থেকে বোঝা গেছে যে ভেতরে ঢোকবার অন্য কোন গোপন উপায় নেই।

লুটভিক্ অবশ্য আমাদের ভয় দেখাতে কিছু বাকি রাখে নি। নিজে থেকে দরজা না খুললে আমাদের হাওয়া বন্ধ করে দেবে বলেও শাসিয়েছে। তাতে ভয় কিন্তু পাই নি।

এ কামরায় ওঠবার পথে হাওয়া কলটা লুটভিক্ই দেখিয়ে এনেছে। যতদূর বুঝেছি ভাগ ভাগ করে কামরা হিসেবে হাওয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা তাতে নেই। হাওয়া বন্ধ করলে লুটভিক্কেও আমাদের মতই জব্দ হতে হবে।

যতই ভয় দেখাক, হাওয়া বন্ধ হয় নি। লুটভিক্ও আমাদের কামরায় ঢুকতে পারে নি। তার শয়তানী পরীক্ষার গিনিপিগ হবার বিভীষিকা এ পর্যন্ত অন্ততঃ ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছে।

এমনি করে পৃথিবীর হিসেবে ক'দিন যে কেটেছে তা ঠিক জানি না। ঘড়ি দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা করে ভাগ করে একটা হিসেব রাখা

যেত। কিন্তু আমাদের দলে সুরঞ্জনের হাতে একটি মাত্র যে ঘড়ি ছিল, ব লির ঝড়ের সংগে যোঝার সময় কখন তা একেবারে বিকল হয়ে গেছে।

নেহাত খিদে পাওয়া ঘুম পাওয়া ধরেই সময়ের যা কিছু আন্দাজ তাই মনের মধ্যে আছে।

সেই আন্দাজ অনুযায়ী অন্ততঃ মাস খানেক ইতিমধ্যে কেটে গেছে। একটা কামরার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া আর বিশেষ অসুবিধে তাতে হয়নি। খাবার-দাবারের অভাব নেই। গিনিপিগের মত আমাদের সুখে-স্বচ্ছন্দে সুস্থ রাখবার জন্য লুটভিক্ বেশ দীর্ঘ কালের মত রসদ এ কামরায় মজুদ রেখেছে।

খাওয়া-দাওয়া আর নিজেদের মধ্যে ভবিষ্যতের হতাশ আলোচনা ছাড়া আমাদের একমাত্র আনন্দ হল জানলা দিয়ে আকাশ দেখা।

তাই দেখতে গিয়েই আজ এই অভাবিত বিস্ময়ের চমক।

কিন্তু সে চমকের মানে বোঝবার আগেই পরমায়ু যে শেষ হয়ে যাবার উপক্রম!

আমার সঙ্গে সুরঞ্জনও বুকে হাত দিয়ে হাঁফাচ্ছে। বটুক আমাদের খাবার নিয়ে আসতে গেছে। তার অবস্থাও সেখানে নিশ্চয় আমাদের মতন।

আর লুটভিক্!

তার কথাটা মনে হওয়াতেই চোখে যেন আরো অন্ধকার দেখলাম।

লুটভিকের কিছু হলে তো এই শূন্যযানই অচল। এতবড় বিপদের মধ্যেও এইটুকু বিশ্বাস মনে ছিল যে, যতই উন্মাদ হোক লুটভিক্, এ শূন্যযান সাধ করে ধ্বংস করবে না। আবার পৃথিবীতে একদিন ফিরবেই। তখন কোন একটা উপায়ে তাকে এড়িয়ে এ বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হবে না, এই ছিল আশা।

কিন্তু এখন যা দেখছি তাতে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নিষ্প্রাণ

দেহগুলো নিয়ে এ শূন্যযান মহাকাশের একটা নিরুদ্দেশে ভাসা উল্কাপিণ্ড হয়েই থাকবে।

কিন্তু এ বুকের কষ্টটাই বা কিসের ?

একসঙ্গে সকলেরই বা এমন করে হবার কারণ কি ?

এটা কি সংক্রামক কোন রোগ ? তা তো মনে হয় না।

তাহলে যা খেয়েছি সেই খাবারের ভেতরকার বিষ টিষ কিছু ?

কিন্তু বিষ যদি হয় তাহলে এতদিন কোন কিছু পাইনি কেন ? আর লুটভিক্ অন্য যাই করুক, তার পরীক্ষার জন্যে পুষে রাখা গিনিপিগদের বিষ দিয়ে মারবার চেষ্টা করবে না।

কিন্তু বুকের যে কষ্টটা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের খাদ্যের কিছু একটু সম্পর্ক কি নেই ? তা না হলে একসঙ্গে আমাদের সকলেরই এক অবস্থা হবার আর কোন কারণ তো ভেবে পাচ্ছি না।

ওই পর্যন্ত ভাবতেই কারণটা হঠাৎ মাথার মধ্যে বিদ্যুৎচমকে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কারণটা, ওই আমাদের খাবারের মধ্যেই তো রয়েছে, তবে বিষের মত কোন মেশানো জিনিসে নয়, শরীরে, বিশেষ করে আমাদের হার্ট-এর অত্যন্ত দরকারী একটি উপাদানের ঘাটতিতে।

কোথায় পাই সে উপাদান !

ওই কষ্টের ভেতরই জোর করে উঠে দাঁড়ালাম।

সুরঞ্জনও একটা ধাক্কা সামলে তখন কাত হয়ে উঠে বসেছে। হঠাৎ ওই অবস্থাতেই সে হাঁ হাঁ করে উঠল।

ও কি ! করছেন কি আপনি ? অগ্নিকাণ্ড করবেন না কি একটা !

আমি তখন সত্যিই একটা টেবিলের পায়া কামাবার ব্লেড দিয়ে চেঁছে সেই ছাঁটগুলোয় দেশলাই দিয়ে আগুন ধরাচ্ছি।

কি ভাগ্যি শূন্যযানের কামরার আসবাবপত্রগুলো মামুলী ও সাধারণ।

টেবিলটা কাঠের না হয়ে প্লাস্টিক কি স্টীলের হলে এ কাহিনী আর তোমাদের শোনার ভাগ্য হত না।

ঘনাদা থামলেন।



আমাদের চারজনের কাউকে আর কিছু বলতে হল না। আমাদের ভাড়াটে ডাক্তারদের তখন ঘোর লেগে গেছে।

তাহলে, অমনি করে কাঠের ছাই যোগাড় করলেন?—মুগ্ধ বিস্ময় ফুটে উঠল কার্ডিওগ্রাম সান্যালের মুখে।

আর ওই কাঠের ছাইয়ের জোরেই সবাই সেরে উঠলেন।—প্রেসার সোম ভক্তিতে গদগদ।

॥ নয় ॥

শুধু সেরেই উঠলাম না—ঘনাদা ঈষৎ হেসে বললেন—আমাদের যা সবচেয়ে বড় সমস্যা তাও মিটিয়ে ফেললাম।

কাঠের ছাই একটু করে মুখে দিয়ে নিজেরা চাঙ্গা হবার পর ব্যস্ত হয়ে উঠলাম লুটভিকের জন্যে।

ওই তো হাড্ডিসার চেহারা। এতক্ষণে টেঁসে গেছে কি না কে জানে।

মাসখানেক যে দরজা বন্ধ ছিল, চেয়ার-টেবিলের ঠেকো সরিয়ে তা খুলে ছুটলাম কণ্ট্রোল রুমের দিকে।

ভয় ছিল, ভেতর থেকে দরজা না বন্ধ করে দিয়ে থাকে। তাহলে ভেঙে খোলা ছাড়া উপায় নেই। অত সবুর কি তখন সইবে?

না, বন্ধ নয়, দরজা খোলাই, আর লুটভিক্ ওই রোগা হাড়েই তখনও টিঁকে আছে।

তবে অবস্থা কাহিল। কি সব অদ্ভুত ঘড়ি-টড়ি আর নানা রংয়ের বোতাম বসানো কণ্ট্রোল বোর্ডের টেবিলটা ধরে কোনমতে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে।

আমরা ঘরে ঢোকার পর চমকে মুখ তুলেও ঘাড়টা সোজা রাখতে পারল না। কিন্তু মাথাটা আবার বুকের ওপর ঝুলে পড়ার আগে চোখের যে দৃষ্টিটা হানল তাতে যেন সাতটা কেউটের বিষের জ্বালা।

আমাদের যত বড় দুশমনই হোক, তাকে এমন করে মরতে দিতে তো পারি না! তাই তাড়াতাড়ি কাঠের ছাইটা তার মুখে দিতে গিয়েও কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম।

ঠিক তো! আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান তো এখন আমারই হাতের মুঠোয়। কাঠ-পোড়া ছাই যার দাওয়াই সেই অসুখই তো আমাদের শাপে বর হয়ে গেছে।

শীগ্‌গির একটা দড়ি আনো।—তাড়া দিলাম বটুককে।

অন্য কেউ হলে নিশ্চয় কি দড়ি, কেন দড়ি জানতে চেয়ে কিছুটা সময় নষ্ট করত। বটুকেশ্বরের ওসব দোষ নেই। হুকুম শোনা মানে সাধ্য থাকলে তামিল করা।

চোখের নিমেষে দড়ি নিয়ে সে হাজির। এবার স্বরঞ্জনকেই বললাম—বাঁধো ওকে।

বাঁধব ?—স্বরঞ্জন দড়ি হাতে নিয়ে হতভম্ব।

হ্যাঁ বাঁধবে।—ধমকে বোঝালাম এবার—এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। এই কাবু অবস্থায় ওকে বাঁধতে পারলে শেষ পর্যন্ত আমাদের রক্ষা পাওয়ার কিছু আশা থাকবে।

এর পর আর দুবার বলতে হল না।

স্বরঞ্জন যখন উৎসাহ ভরে হাতে পায়ে দড়ির বাঁধন দিচ্ছে, লুটভিকের মুখে তখন একটু ছাই ভরে দিলাম।

চাঙ্গা হয়ে উঠতে তার দেরী হল না। কি তখন তার মুখের তোড়! ফরাসী জার্মান ইংরেজী রুশ এমন কি এদেশে থাকার দরুণ দেহাতী রাজস্থানী ভাষারও কোন গালাগাল দিতে সে বাকি রাখলে না।

বটুকেশ্বর নির্বিকার।

স্বরঞ্জন রেগে তখন ফুলতে শুরু করেছে। বললে—দেব মুখটায় একটা কিছু গুঁজে ?

কণ্ট্রোল বোর্ডটা তখন ভাল করে লক্ষ্য করছি। দেখতে দেখতেই বললাম—না, ওকে কথা বলাবার দরকার হবে। মুখ বন্ধ করলে তাই চলবে না।

গালাগাল ছেড়ে কথা কি সহজে বলে! ভাল ভাবে অনেক চেষ্টা করেও বিফল হয়ে শেষে চালাকী করে বলাতে হল।

যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা চাবি ঘুরিয়ে দিতে গেলাম।

নেকড়ের দৃষ্টি নিয়ে লুটভিক্ আমায় লক্ষ্য করছে তা জানি। আমার কাণ্ড দেখে একেবারে রেগে আগুন হয়ে চিৎকার করে উঠল। —সর্বনাশ! ওটা ছুঁসনি আহাম্মক জানোয়ার কোথাকার! এখুনি উল্টো বেগের যন্ত্র চালু হয়ে যাবে।



তাহলে এই বোতামটা টিপে দেখি।

বলে, আরেকটা ক্ষুদে বাল্‌বের মত উজ্জ্বল বোতাম টিপতে গেলাম।

না, না না!—এবার লুটভিকের প্রায় আর্তনাদ—ও বোতাম টিপলে আর রক্ষা নেই। দশগুণ বেগ বেড়ে শূন্যযান ওই ফোবস্ কি ডিমস্-এর ওপরেই আছড়ে পড়বে।

ফোবস্? ডিমস্?

বিস্মিত প্রশ্নটা লুটভিকের কাছে ঘনাদার নয়, ঘনাদারই কাছে আমাদের। এতক্ষণ বাদে ধরা-ছোঁয়ার মত ছুটো নাম শুনে আর চুপ করে থাকতে পারা যায়!

ফোবস্ ডিমস্ মানে তো সেই ছুটো চাঁদ?—শিবু ঘনাদার সমর্থন চাইলে।

ও চাঁদ ছুটো তো মঙ্গলগ্রহের!—আমি জোরের সঙ্গেই জানালাম।

তার মানে আপনারা তখন মঙ্গলগ্রহের কাছে পৌছে গেছেন! —শিশির সবিস্ময়ে জানতে চাইলে।

হ্যাঁ—ঘনাদা শিশিরের টিন থেকে নতুন সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে তিনটে সুখটান শেষ না করা পর্যন্ত আমাদের মহাশূন্যেই একরকম ঝুলিয়ে রেখে দিলেন।

কিন্তু শেষ টানের পর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নিজেই যেন তার মধ্যে হারিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি যেন বলছিলাম?

কি বলছিলেন ধরিয়ে দেবার জন্যে সব ক'টা গলা মুখর হয়ে উঠল।

বলছিলেন ফোবস্ আর ডিমস্-এর কথা।

লুটভিক্ বলে সেই পাজী পাগলটাকে তখন বেঁধে ফেলেছেন।

নিজেরা চাঙ্গা হয়েছেন কাঠের ছাই খেয়ে।

যন্তর-টন্তর আনাড়ি হাতে নাড়তে গিয়ে প্রায় আছড়ে ভেঙে ফেলেছেন উড়োজাহাজটা।

উড়োজাহাজ নয় আহাম্মক কোথাকার! মহাশূন্যে কি হাওয়া আছে যে উড়োজাহাজ চলবে! জেট প্লেনও সেখানে পাত্তা পায় না।

শুনলি না ঘনাদার সে এক আজব পুষ্পক রথ! পৃথিবী থেকে যেতে আসতে হাওয়ার ঘর্ষণে পোড়ে না, আর আমাদের ঘর-বাড়ির মতই তার আসবাবপত্র।

আরে উনি কি সত্যিই যন্তর-টন্তরে আনাড়ি হাত লাগাচ্ছিলেন নাকি! ওই ভান করে ওই পাগলা বদমাসটার পেটের কথা সব বার করে নিলেন বুঝলি না?

আমাদের তিন ভাড়াটে সভায় এমন জ্বালা হয়ে উঠবে আগে কি জানতাম! কোনরকম তাদের কোরাস গলার ফাঁকে নিজেদের কথাটা গলিয়ে দিয়ে বললাম—লুটভিকের কথায় কোথায় পৌছেছেন তার যেন একটু আভাস পেয়েছেন।

ঠিক! ঘনাদা যেন লাইন ধরতে পেরে খুশি হলেন—ফোবস্ ডিমস্-এর নাম শুনেই বুঝলাম নির্ঘাৎ মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি পৌছে গেছি। আনাড়ি আহাম্মক সেজে প্যাঁচ করে লুটভিকের কাছে যন্তর চালাবার মোটামুটি কায়দাও তখন জানা হয়ে গেছে।

এবার জরুরী একটা পরামর্শের বৈঠকে বসতেই হয়।

লুটভিক্‌কে বাঁধা অবস্থায় তার চেয়ারেই বসিয়ে রেখে নিজেদের কামরায় ফিরে এলাম।

সুরঞ্জন দারুণ উত্তেজিত। ছোকরা শুধু গানই গায় না, জোতি-র্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়াশোনাও যে আছে তা তার প্রথম কথাতেই টের পেলাম। প্রশ্ন যা করলে তা কিন্তু একটু ভড়কে দেবার মত!

জিজ্ঞাসা করলে—আপনি লুটভিকের কথা বিশ্বাস করেন?

তার মানে? বিশ্বাস না করবার কি আছে!—অবাক হয়ে বললাম—ও মিথ্যে বলবে কেন? বিশেষ ওই রকম আত্তকে-ওঠা অবস্থায়?

ওর মত শয়তান সব পারে! সুরঞ্জন গম্ভীর ভাবে জানালে—আমাদের গুলিয়ে দেবার জন্যেই যে, ডিমস্ ফোবস্-এর নাম করে নি তার ঠিক কি!

বেশ একটু ভাবনায় পড়েই বললাম—কিন্তু একটা চাঁদ আমরা তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি। মাপে-টাপে ফোবস্-এর সঙ্গেই মিলছে।

ঠিক মিলছে কি ?—সুরঞ্জন সন্দেহ প্রকাশ করলে—চাঁদ বলতে যত ছোটই হোক বলের মত গোল একটা কিছু তো হবে। যা দেখেছি তা তো একটা পাহাড়ের ভাঙা টুকরো বলা যায়। তা ছাড়া আমার তো মনে হয় মঙ্গলগ্রহের সত্যিকারের চাঁদ বলে কিছু নেই। যা আছে তা কৃত্রিম উপগ্রহ। মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি পৌঁছলে আমরা সেই স্যাটেলাইট দুটোই দেখতে পেতাম।

এবার একটু হাসলাম। বললাম—বুঝেছি কোথা থেকে তোমার এ ধারণা হয়েছে। তুমি স্ক্লোভস্কি পড়েছ ?

হ্যাঁ, পড়েছিই তো !—সুরঞ্জন উৎসাহিত হয়ে উঠল—তিনি স্পষ্ট হিসেব করে দেখিয়ে গেছেন যে, ষোল আর ন' কিলোমিটার ব্যাসের ওই উপগ্রহ দুটো স্বাভাবিক চাঁদ হতেই পারে না। আমাদের চেয়ে কোন সভ্য বৈজ্ঞানিক জাত কোন কালে ওই দুটো স্যাটেলাইট তৈরী করে আকাশে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। সে জাত এখন না থাকতে পারে, কিন্তু তাদের তৈরী উপগ্রহ এখনো চাঁদের মত মঙ্গলগ্রহকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে।

তুমি ঠিকই বলেছ। হেসে বললাম—বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক স্ক্লোভস্কি ওই রকমই লিখে গিয়েছিলেন বটে। তাঁর কথায় তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল যেমন পড়েছিল ১৮৭৭-এ গত শতাব্দীতে ইটালীর জ্যোতির্বিদ জোভানি স্কিয়াপারেললি-র মঙ্গলগ্রহের বুকে কাটা খালের রেখা আবিষ্কারের ঘোষণার পর।

স্কিয়াপারেললির কাটা খালের রেখা দেখা, আর স্ক্লোভস্কির কথার তফাত আছে। কাটা খালের রেখা তো পরে ভালো উন্নত দূরবীনের দেখায় ভুল বলে জানা গেছে—সুরঞ্জন আমার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটার প্রতিবাদ জানালে—কিন্তু মঙ্গলগ্রহের চাঁদ যে কৃত্রিম তার অন্য প্রমাণও আছে। প্রথম হল ফোবস্ যার নাম সে চাঁদের গতি। সে উপগ্রহটা মঙ্গলের দিন-রাত্রির অর্ধেক সময়ের মধ্যে মঙ্গলকে এক

চক্কর দিয়ে আসে। মঙ্গলের দিন আমাদের পৃথিবীর দিন-রাত্তিরের চব্বিশ ঘণ্টার সামান্য কয়েক মিনিট বেশী। ফোবস্-এর মঙ্গল ঘুরে আসতে লাগে মাত্র এগারো ঘণ্টা। ডিমস্-এর ব্যাপার আবার একেবারে উল্টো। সমস্ত সৌরমণ্ডলে সব গ্রহের মোট বত্রিশটি চাঁদ আছে। ফোবস্-এর মত এত বেগে কোন চাঁদ ঘোরে না। ডিমস্ আবার একেবারে সৃষ্টিছাড়া। তার গতি আর সব চাঁদ যে দিকে ঘোরে তার উল্টো মুখে।

না।—এবার সুরঞ্জনকে থামাতে হল—তুমি এত কিছু জেনেও একেবারে হালের খবর জান না। ফোবস্ যে মঙ্গলগ্রহকে এত তাড়াতাড়ি কেন চক্কর দেয় তার হদিস না পেলেও জ্যোতির্বিদরা এখন জানেন যে ফোবস্-এর আকার এমন গোল নয় যে তার ব্যাস সঠিক হিসেব করা যায়। সূক্ষ্ম আধুনিক পর্যবেক্ষণে জানা গেছে যে ফোবস্ লম্বায় ১৪ ৮ কিলোমিটার আর চওড়ায় ২০'৮ একটা পাথরের চাংড়া। সুতরাং আমরা যা দেখেছি সেটা ফোবস্ বলেই মনে হয়। ডিমস্ যে উল্টোদিকে ঘোরে এ ধারণাও ভুল। ফোবস্ যেমন অত্যন্ত চটপট, ডিমস্ তেমনি একেবারে গদাইলস্করি চালে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে। এ প্রদক্ষিণে তার চব্বিশের চেয়ে আরো ঘণ্টা তিনেক বেশী লাগে বলে মনে হয় সে যেন উল্টোদিকে যাচ্ছে। মঙ্গলগ্রহের ওপর থেকে দেখলে তো তাকে শামুকের গতিতে আড়াই দিনে উল্টো দিকে অস্ত যেতে দেখা যাবে। ডিমস্ সম্বন্ধে ভুল ধারণাটা এই থেকেই গড়ে উঠেছে।

ওখানে তো ঝড় হচ্ছে!

চমকে উঠলাম। যার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম নিজেদের তর্কে মশগুল হয়ে সেই বটুকেশ্বরের গলা। কিন্তু সে বলছে কি?

ঝড়! ঝড় আবার কোথায়?

ওই তো ওখানে!

বটুককে আর আঙুল দেখাতে হল না। তার ঘাড় ঘোরানো

দেখেই জানালার দিকে আমরা দু'জনেই তখন ছুটে গেছি। নিজেদের অত্যন্ত আহাম্মক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। হাতে পাঁজি থাকতে মঙ্গলবার নিয়ে তর্ক কেউ নইলে করে!

ওই তো সামনে মঙ্গলগ্রহ! অন্ততঃ তাই বলেই আমার ধারণা। কিন্তু বটুক যা বলেছে তাও তো মিথ্যে নয়। সত্যিই ওখানে ঝড় উঠেছে। এমন প্রচণ্ড ঝড়, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রচণ্ড সাইক্লোনও যার কাছে ছেলেখেলা।



ভালো করে কিছু দেখবারই তো উপায় নেই। ধুলোয় সমস্ত গ্রহ আচ্ছন্ন।

এত ঝড় যেখানে ওঠে সেখানে হাওয়া আছে নিশ্চয় !—সুরঞ্জন নিজেকেই বোঝাবার জন্যে যেন বলেছে—আর হাওয়া মানে কি ?

হাওয়া মানেই প্রাণ নাও হতে পারে !—সত্যের খাতিরে সুরঞ্জনকে বলতে বাধ্য হয়েছি—মঙ্গলগ্রহের হাওয়া যা আছে তা অত্যন্ত পাতলা। তাতে প্রাণধারণের উপযুক্ত অক্সিজেন আছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। একমাত্র যা বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ বাড়িয়েছে তা হল মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণমেরু অঞ্চলে বেশ যথেষ্ট জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব। জল থাকার লক্ষণ মঙ্গলগ্রহের অন্য জায়গাতেও নাকি পাওয়া গেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকরা ও গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তেমন আশান্বিত নন। ওই একান্ত প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রাণ যদি বা থাকে, তা ভাইরস কি লিচেন-এর চেয়ে উঁচু পর্যায়ের হতে পারে না বলে তাঁদের ধারণা। কেউ কেউ তো সে সম্ভাবনাও স্বীকার করেন না। সৌরমণ্ডলে তো নয়ই, সমস্ত নীহারিকা-মণ্ডলীতেও কোথাও পৃথিবীর মত প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তন হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

আপনার বিশ্বাসও যেন তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু···সুরঞ্জন বেশ ক্ষুণ্ণ স্বরেই আরো কিছু বুঝি বলতে যাচ্ছিল।

হাঁ—তাকে বাধা দিয়ে বললাম—একটা 'কিন্তু'র ওপরেই আমারও ভরসা।

'কিন্তু'র ওপর ভরসা !

সুরঞ্জন নয়, আমাদেরই বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

'কিন্তু' হল একটা উল্কা। মর্চিসন মিটিওরাইট নামে যা বিখ্যাত হয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়ার এক চাষীর খামারে সেটা পড়েছিল।

ঘনাদার কাছে এই হয়তো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

উল্কা পড়েছিল তাতে হয়েছে কি ?—জিজ্ঞাসা করতে হল—কত

উল্কাই তো পৃথিবীতে পড়েছে। আমাদের কলকাতার ম্যুজিয়মে গেলেই অমন কত উল্কা দেখা যাবে।

এ উল্কা সে সব থেকে আলাদা।—ঘনাদা বিশদ হলেন—এ উল্কার ভেতর এমন জিনিস পাওয়া গেছে যার দ্বারা প্রাণের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। জিনিসটা হল প্রাণের প্রধান উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড। উল্কা আসে পৃথিবীর বাইরের কোন মহাশূন্য থেকে। কোন উল্কায় অ্যামিনো অ্যাসিডের চিহ্ন পেলে পৃথিবীর বাইরেও কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলেই তাই মনে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য যেমন খুঁতখুঁতে, তেমনি সন্দিগ্ধ। অ্যামিনো অ্যাসিডের চিহ্ন পেয়েও তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাঁরা খটকা লাগাতে চেয়েছেন এই বলে যে অ্যামিনো অ্যাসিডের চিহ্ন মানেই অপার্থিব অন্য কোন গ্রহের প্রাণের প্রমাণ মনে করব কেন? উল্কা পৃথিবীতে এসে পড়বার পর তাতে এখানকার প্রাণেরই কেমন করে একটু ছোঁয়া যে লাগে নি তার ঠিক কি? এ সন্দেহের জবাব একমাত্র ওই মর্চিসন মিটিওরাইট-এই আছে।

উল্কার মধ্যে সে আবার কি জবাব?

জবাব এই যে ও উল্কাপিণ্ডের মধ্যে যে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গেছে তা ডান-হাতি।

ডান-হাতি!

ঘনাদা কি আমাদের আবোল-তাবোল পড়াচ্ছেন?

না আবোল-তাবোল নয়। ঘনাদা করুণা করে আমাদের তারপর বুঝিয়ে দিলেন—পৃথিবীর প্রাণবস্তুর যে অ্যামিনো অ্যাসিড, তার অণুর গঠন বাঁ-হাতি, অর্থাৎ অণুগুলো বাঁ দিক দিয়ে ঘুরিয়ে সাজানো। আর মর্চিসন উল্কায় তা ডান-হাতি। এই খানেই আমার 'কিন্তু' আর এই 'কিন্তু'র ওপরই ভরসা। এ প্রমাণও সন্দেহে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। কেউ কেউ বলছেন, ও ডান-হাতি অণু দিয়েও কিছু প্রমাণ হয় না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকবার পর প্রচণ্ড উত্তাপে বাঁ-হাতি গড়ন ডান-হাতি হয়ে গেছে। অবিশ্বাসীরা যে যাই বলুক, ওই মর্চিসন মিটিওরাইট-এর 'কিন্তু'র ভরসা আমি ছাড়িনি।

॥ দশ ॥

মঙ্গলগ্রহে গিয়ে নামবার পর সে 'কিন্তু'র ওপর ভরসা কিন্তু আর রাখা গেল না।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত অনেক প্যাঁচ করে মঙ্গলগ্রহে গিয়েই নামলাম। প্যাঁচের মধ্যে আসল হল লুটভিক্‌কেই কখনো রাগিয়ে কখনো ভয় দেখিয়ে শূন্যযানের কল-কৌশল একটু বুঝে নেওয়া।

ভাগ্যি ভালো যে তখনো শূন্যযানের আসল রহস্য কিছু জানতে পারি নি। শুধু চালাবার কৌশলটাই শিখে নিয়েছি। চালাবার কায়দা-কানুন তার অতি সোজা। বোতাম টেপো, হাতল টানো, চাকতি ঘোরাও ডাইনে বাঁয়ে, আর নজর রাখ ক'টা আলোর ওপর। আমাদের ট্র্যাফিক সিগন্যালের উল্টো নিশান সেখানে। যতক্ষণ লাল ততক্ষণ কামাল। হলদে কি নীল হলেই হুঁশিয়ার হয়ে এদিকের বোতাম টেপো কি ওদিকের হাতল টানো।

সৃষ্টিছাড়া কি সর্বনাশা জিনিস নিয়ে যে কারবার করছি তা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি বলে অকুতোভয়ে কলকব্জা নেড়ে-চেড়ে শূন্যযান মঙ্গলের পিঠে গিয়ে নামিয়েছি।

ধুলোর ঝড় তখন থিতিয়ে এসেছে। তবু চারিদিক বেশ কিছুটা ঝাপসা।

শূন্যযান থেকে বার হতে তখনও সাহস করিনি। বাইরে আমাদের নিশ্বাস নেবার জন্য হাওয়া তো থাকবারই কথা। যদি বা থাকে তা পৃথিবীর প্রাণীর পক্ষে বিষও তো হতে পারে।

মঙ্গলগ্রহে এসে পৌঁছেছি তাই যথেষ্ট। সেখানে নেমে কোন লাভ হবে কি না তাই তখন ভাবছি।

জানলা দিয়ে গ্রহের যা চেহারা চোখে পড়ছে তা নামবার উৎসাহ

বাড়াবার মত নয়। বিচক্ষণ-বৈজ্ঞানিকেরা যা অনুমান করেছেন সেই ধু ধু মরু।

যন্ত্র-ঘরে টাঙানো মানচিত্র দেখে বুঝলাম মঙ্গলগ্রহের ইলেক্‌ট্রিস্ যার নাম দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটাতেই নেমেছি।

হাওয়ার অস্তিত্ব মাপার যন্ত্রটা বিকল, কিন্তু জলীয় বাষ্প মাপবার যন্ত্রটায় দেখলাম পৃথিবী থেকে যা ধারণা হয় মঙ্গলগ্রহ তার চেয়েও অসম্ভব রকম শুকনো। পৃথিবীর মরুপ্রদেশের হাওয়াতে যা জলীয় বাষ্প আছে, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় বাষ্পের পরিমাণ তার প্রায় দু-হাজার ভাগের মত।

হাওয়ার ব্যাপারটা নাই জানা যাক, এত শুকনো আবহাওয়ায় কোন প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভবই ধরে নিতে হয়।

মিছিমিছি এ শ্মশান-প্রান্তরে নেমে তাহলে লাভ কি! মঙ্গলগ্রহে নামতে পেরেছি সেই গর্বটুকু নিয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করাই তো ভাল।

অক্সিজেন মুখোশ নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে নেমে একটু ঘুরে আসা অবশ্য যায়। কিন্তু তাতেও অজানা ভয়ঙ্কর কোন বিপদ যে নেই তাই বা কে বলতে পারে!

অন্য কিছু না হোক এখানকার নামমাত্র হাওয়ার ছাঁকনিতে অবারিত আল্ট্রাভয়োলেট আর কসমিকরে অর্থাৎ মহাজাগতিক রশ্মির বৃষ্টিই মানুষের পক্ষে মারাত্মক হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

জানলায় দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ বটুকের কথায় চমকে গেলাম।

বটুক অবশ্য উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে কিছু বলে নি। তার সেই নিজস্ব মার্কামারা মুখস্থ পড়া বলার ধরনেরই কথা।

কিন্তু কথা যা বলেছে তা সত্যিই চঞ্চল করে তোলবার মত। আর কেউ হলে যে কথাটা বলতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একাকার করত। বটুকেশ্বর তাই বলেছে নেহাত যেন কলকাতার বাড়িতে বসে 'বাজারে যাচ্ছি' বলার মত। কথাটা কিন্তু হল—বেরিয়েই লুকোল।

বেরিয়েই লুকোল! সে কি! কি লুকোল? কোথা থেকে-বেরিয়ে? কোথায়?

আমি আর সুরঞ্জন দুজনেই তার দিকে ফিরে ব্যাকুল উত্তেজিত অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

ওই একটা জাঁতার কাছে। বটুকেশ্বরের ভাবান্তর নেই।

জাঁতার কাছে! জাঁতা!—আমরা আরও হতভম্ব।

তার পরই অবশ্য খেয়াল হয়েছে যে বটুকেশ্বর তার নিজের বুদ্ধিতে একরকম বুঝিয়ে যা বলতে চেয়েছে তা খুব ভুল নয়। এই মরুভূমির ভেতর বেশ দূরে দু-তিনটে যে পাথরের চাঁই দেখা যাচ্ছে সেগুলোকে দেখতে খানিকটা যেন দৈত্যদানোর বিরাট জাঁতার মত চ্যাপ্টা গোল গোছের।

কিন্তু সেই জাঁতার কাছে বেরিয়েই লুকোলটা কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে বটুক সামান্য একটু যেন অবাক হয়েছে আমাদের দৃষ্টিশক্তির অভাবে।

আপনারা দেখতে পান নি? ওই যে ছোটবড় মাথায় মাথায় বসানো ক'টা জালা!

ক'টা জালা তাও আবার বেরিয়েই লুকিয়ে গেল! বলছে কি বটুকেশ্বর!

জাঁতার উপমাটা ঠিকই একরকম দিয়েছিল, কিন্তু এই জালার ওপর জালা দেখা তো নির্ঘাৎ মাথা খারাপের লক্ষণ।

শেষে বটুকেশ্বরেরও মাথা খারাপ হল দেখে তখন সত্যি দুঃখ হচ্ছে। যে-কোন অবস্থায় একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা বটুকেরই যখন মাথা খারাপ হল তখন আমাদের আর হতে কতক্ষণ বাকি!

মাথা খারাপ হওয়ায় অবশ্য অপরাধই বা কি? থরের মরুর ঝড়ে প্লেন থেকে নামার পর থেকে যা আমাদের ওপর দিয়ে যাচ্ছে তাতে মাথা যে এতক্ষণ ঠিক ছিল সেইটেই ভাগ্য।

কারুর মাথায় গোলমাল শুরু হলে তখন তাকে ঘাঁটিয়ে অসুখ বাড়বার সুযোগ দিতে নেই।

বটুকের কথাটাই তাই যেন মেনে নিয়ে তাকে একটু খুশি করবার জন্যে বললাম—জালাগুলো কারুর মাথায় ছিল বুঝি?

না—বটুক মাথা নেড়ে জানালে—পর পর কটা যেন জালা, ওপরেরটা ছোট—মাঝেরটা বড়, আর তার নিচের দুটো কলসি। সেগুলো নিজে থেকেই বেরিয়ে আবার জাঁতার আড়ালে চলে গেল।

তা যদি গিয়ে থাকে তাহলে আবার দেখা যাবে নিশ্চয়।—বটুককে উৎসাহ দিলাম—চোখের দোষ তোমার নেই যে বলব ভুল দেখেছ।

বটুক জবাব দিলে না। কিন্তু মনে মনে আমি তখন ওই সম্ভাবনা-টাই সঠিক বলে ধরে নিয়েছি। বটুকের চোখের দৃষ্টি খুব প্রখর, কিন্তু মাথা খারাপ যদি নাও হয়ে থাকে, দেখতে এবার তার ভুল যে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুরঞ্জনও ব্যাপারটা বুঝেছে নিশ্চয়। তবু চোখের ইশারায় তাকে বটুককে একটু সামলে রাখতে বলার জন্যে তার দিকে চাইতে গিয়ে একটু অবাক হলাম।

সুরঞ্জন যে ভাবে চোখ দুটো জানলায় প্রায় সেঁটে ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে তাতে বটুকের কথায় তার খুব অবিশ্বাসের লক্ষণ তো নেই।

তার সম্বন্ধে একটু ভাবিত হয়ে আধা-ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমিও জালা টালা দেখতে পাচ্ছ নাকি?

এখনও পাইনি।—আমার দিকে মুখ ফিরিয়েই সুরঞ্জন উত্তর দিলে কিন্তু বটুক যখন দেখেছে তখন তা একেবারে ভুল হতে পারে না।

এবারে হেসে ফেলে বললাম—বটুকের দেখা ঠিক হলে তো পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা সব বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাবেন। হাওয়া-

নেই জল নেই এমন যমের অরুচি মরুভূমির দেশ, অতি বড় আশাবাদী বৈজ্ঞানিকও যেখানে ভাইরাস কি লিচেনের চেয়ে উঁচু ধাপের প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে মনে করেন না, সেখানে একবারে জালা-প্রমাণ জানোয়ার! তাও আবার পর পর সাজানো জালা!

একটু থেমে আবার বলেছি—দেখো জালা-জন্তুর অস্তিত্ব যদি প্রমাণ করতে পার তা পৃথিবীতে ফিরে বিজ্ঞান-জগতে একটা হুলুস্থূল বাধিয়ে তুলতে পারবে। তা পৃথিবীতে ফেরার ব্যবস্থা করার জন্যেই লুটভিকের একবার খবর নিয়ে আসা দরকার।

তখনই যদি লুটভিকের খোঁজে যাবার জন্যে অত ব্যস্ত না হই তাহলে জর্জ বিশ্বাস আর পঙ্কজ মল্লিক, মান্না দে আর তালাত মাহমুদের সঙ্গে আরেকটা ভারত-জোড়া নাম আজ গানের জগতের গর্ব হয়ে থাকে। সুরঞ্জন সরকার নামটা আজ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু তা হবার নয়। ও নামটা পৃথিবীর গানের জগতে আর লেখাই হল না।

ঘনাদা একটু ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থামলেন।

তার মানে, হল কি সুরঞ্জন সরকারের? উতলা হয়ে উঠলেন কার্ডিওগ্রাম সান্যাল।

মারা গেলেন নাকি?—ব্লাডপ্রেসার সোম দারুণ উদ্বিগ্ন।

ওই কাঠ-পোড়া ছাইতেও কাজ হল না? ব্লাডটেস্ট গুপ্তের বেয়াদবী আশঙ্কা।

কাঠ-পোড়া ছাইয়ে কাজ হবে না কেন? তারই জোরে সব তো তখন চাঙ্গা। আহাম্মকদের বেওকফি বেচাল বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি শুধরে দিতে হল আমাদেরই—সুরঞ্জন সরকার বোধ হয় হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল, না ঘনাদা?

কাঠ-পোড়া ছাইয়ের অপমানে বিপজ্জনক ভাবে কোঁচকানো ভুরুটা কিছুটা সরল হতে দেখে সাহস করে আবার একটু ন্যাকা

সাজলাম—মঙ্গলগ্রহের ওই ইলেকট্রিসিটিতে শেষ পর্যন্ত ওরই জন্যে নামতে হল বুঝি ?

ইলেকট্রিসিটি নয়, ইলেকট্রিস—ঘনাদা সানন্দে সংশোধন করে আবার শুরু করলেন—ইলেকট্রিস হল মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্ধের একটা জায়গা। সেখানে নামবার সত্যিই বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। নামতে যদি হয় মঙ্গলের উত্তরমেরুর কাছাকাছি নামলেই লাভ কিছু হতে পারে। সেখানকার মেরুর আইসকাপ অর্থাৎ হিমমুকুট জল নয়, জমানো কার্বন ডায়ক্সাইড দিয়ে তৈরী বলে অনেক জ্যোতিষি বৈজ্ঞানিকের ধারণা, কিন্তু, সে ধারণা বাতিল করবার মত প্রমাণও আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। পৃথিবীর মেরু প্রদেশের মত মঙ্গলেও গ্লেসিয়ার অর্থাৎ হিমবাহ আছে বলে জানা গেছে। কার্বন ডায়ক্সাইডের শুকনো তুষার থেকে কিন্তু হিমবাহ সৃষ্টি হয় না। হিমবাহের অস্তিত্ব থেকেই সেখানে জল আছে বলে সুতরাং ধরে নেওয়া যায়। আর জল থাকলে সেখানেই অন্ততঃ প্রাণের চিহ্ন পাবার আশা কিছুটা করা যেতে পারে।

ইলেকট্রিস থেকে শূন্যযান উড়িয়ে আবার উত্তরমেরু অঞ্চলে নামতে হলে অবশ্য আরো অনেক হাঙ্গামা করতে হত। সে হাঙ্গামা পোহাবার উৎসাহ শেষ পর্যন্ত হত কিনা জানি না—কিন্তু তার অবসরই আর হল না।

কণ্ট্রোল রুমে লুটভিক্‌কে দেখে আসতে গিয়ে তার একটা গালাগাল শুনে এসে আমাদের কামরায় ঢুকে একটু অবাক হলাম।

সুরঞ্জন আর বটুক গেল কোথায় ?

এতদিন বাদে নিজেদের বানানো কয়েদঘর খুলে বার হবার সুবিধে পেয়ে শূন্যযানটা ভাল করে ঘুরে দেখতে গেছে নাকি! তাই যাওয়াই সম্ভব।

বটুক যে জালা-জন্তুর আভাস দেখেছিল, তা আর দেখতে পায়নি·

নিশ্চয়। তা পেলে এ জানালা থেকে সুরঞ্জনকে কি পড়ানো যেত?

বটুকের চোখের জোর সত্যিই যে অসাধারণ তার প্রমাণ আগেও পেয়েছি। কিন্তু এবারে তার অমন দৃষ্টি-বিভ্রম কি থেকে হল, জানলায় একবার দেখতে গিয়ে একেবারে থ হয়ে গেলাম।

এ আমি কি দেখছি!

শেষকালে আমারও চোখে ধাঁধাঁ লাগল নাকি!

সত্যিই বড় বড় পাথর ছড়ানো রাঙা বালির প্রান্তর দিয়ে ও কি রকম দুটো কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি চলে যাচ্ছে।

কিন্তু বটুক যা বলেছিল সে রকম কিছু তো এ মূর্তিগুলো নয়। বটুক জালার ওপর জালা বসানো এক রকম অদ্ভুত চেহারা চকিতে দেখবার কথা বলেছিল।

আমি যা দেখছি তার সঙ্গে জালা কি কলসির কোন মিল কিন্তু নেই।

এগুলো যেন···

ওই পর্যন্ত ভাবতে গিয়ে যেন বিদ্যুতের শক্ খেয়ে চমকে আমাদের কামরার বাইরের একটা ছোট কুঠরিতে ছুটে গেলাম।

দরজা খুলে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পরই চক্ষু স্থির।

ঠিক যা ভয় পেয়েছিলাম তাই।

এ কুঠরিটা শূন্যযানের কিছু খুঁটিনাটি দরকারী জিনিসের সঙ্গে অক্সিজেন মুখোশ, স্পেস-স্যুট ইত্যাদি রাখবার জায়গা।

লুটভিক্ সেই প্রথম দিন এ কুঠরি আর তার সাজ-সরঞ্জাম আমাদের দেখিয়ে আনতে ভোলে নি।

অন্য জিনিসপত্রের মধ্যে সেদিন এক সারিতে দাঁড় করানো গোটা পাঁচেক একটু অদ্ভুত ধরনের স্পেস-স্যুট দেখার কথা স্পষ্টই মনে আছে।

সেই স্পেস-স্যুটের সারির দিকে চেয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। দুটো পোশাক সেখানে নেই। কেন যে নেই তা আর বুঝতে দেরী হল না।

ছুটে গিয়ে আবার জানলার কাছে দাঁড়ালাম।

স্পেস-স্যুট পরা চেহারা দুটো তখন অনেক দূরে চলে গেলেও একেবারে অদৃশ্য হয় নি। বটুক যেগুলোকে জাঁতা বলে বোঝাতে চেয়েছিল দূরের সেই রকম একটা চ্যাপটা পাথরের চাঁইয়ের দিকেই সে দুটো যাচ্ছে।

মূর্তি দুটো যে স্পেস-স্যুট পরা সুরঞ্জন আর বটুকেশ্বরের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ তখন অবশ্য মনে নেই।

কিন্তু ওদের দুজনের হঠাৎ এ সর্বনাশা খেয়াল হল কেন?

বটুক যা বলেছিল তারপর সুরঞ্জন জানলা থেকে সে রকম কোন জালা-মূর্তি কি দেখতে পেয়েছে?

তা পেয়ে থাকলে আমাকে তা জানাবার ফুরসুৎটুকুও তাদের হয় না কেন?

আমি তাদের এ সঙ্কল্পে বাধা দেব এই ভয়ে?

কিন্তু বটুক যা দেখেছে সুরঞ্জনও সে-রকম কিছু দেখে থাকলে আমি বাধা দিতে যাব কেন? ভেবে দেখতে গেলে মনে হয়, তাদের এমন ভাবে বেরিয়ে পড়াটা নিছক খেয়াল বলেই আমায় কিছু জানাতে তারা চায় নি।

বটুক যা দেখেছে বলেছে তাই বিশ্বাস করার দরুণ একবার বেরিয়ে খোঁজ করবার লোভ সুরঞ্জন সামলাতে পারে নি।

কাজটা ওদের খুবই অন্যায় হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তখন কি করব?

আরেকটা স্পেস-স্যুট পরে তাদের পেছনে বেরিয়ে পড়ব?

কিন্তু তাহলে শূন্যযানটায় একা লুটভিক্‌কে রেখে তো চলে যেতে হয়।

লুটভিক্ অবশ্য বাঁধা আছে। কিন্তু তাকে বিশ্বাস কিছু তো নেই। চোখে চোখে না রাখলে কি যে সে করবে কে বলতে পারে। একবার কোন উপায়ে বাঁধনগুলো খুলতে পারলে তো আমাদের সর্বনাশ। পৃথিবীতে ফেরার আশা তাহলে তো নেই-ই, এখানে এই মঙ্গলগ্রহেই কি পৈশাচিক প্রতিশোধ সে নেবার চেষ্টা করবে কে জানে।

তাকে একলা ছেড়ে যেতে তাই রীতিমত দ্বিধা হয়।

সে দ্বিধাও অবশ্য শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারল না।

জানলা দিয়ে সারাক্ষণই বাইরে নজর রেখেছিলাম। সুরঞ্জন ও বটুকের মূর্তি দুটো ক্রমশঃ ছোট ও অস্পষ্ট হয়ে এলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তারপর একটা জাঁতা-পাথরের আড়ালে তারা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর অস্থির হয়ে উঠলাম।

জাঁতা পাথরের আড়ালে মূর্তি দুটো একবারে মিলিয়ে গেল নাকি ?

তা না গেলে যত ছোটই হোক মূর্তিগুলোকে জাঁতা-পাথরের পেছন থেকে বার হবার পর দেখতে পাওয়ার কথা।

ওরা দুজনে ওখানেই থেমে গেছে তাহলে। থেমে যাওয়ার কারণটা কি ?

জালা গোছের চেহারা তো বটুকের কথা মত ওই রকম একটা জাঁতা-পাথরের ধার থেকেই বেরিয়ে আবার লুকিয়ে পড়েছিল।

এখন ওখানে গিয়ে সে জালা-জন্তুর নতুন কোন চিহ্ন ওরা কি তাহলে পেয়েছে ?

ধৈর্য ধরে আর থাকা গেল না। কন্ট্রোল রুমে গিয়ে লুটভিক্‌কে আর একবার দেখে এসেই স্পেস-স্যুট পরে শূন্যমানের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

শূন্যযানের এয়ারলক্‌টা বন্ধ করে বাইরে লালচে বালির ওপরে

এসে দাঁড়াবার পর বুকটা একবার যে ছাঁৎ করে উঠল সে কথা অস্বীকার করতে পারব না।

মনে হল শূন্যযান ছেড়ে এসে নিজেদের নিয়তি কি নিজেরাই শিলমোহর করে এলাম!

ও শূন্যযানে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার ভাগ্য কি আর হবে?

সে বিষয়ে আশঙ্কা উদ্বেগ যতই থাক সুরঞ্জন আর বটুকের খোঁজ আগে না করলে নয়।

যে জাঁতা-পাথরের কাছে তাদের শেষ দেখেছিলাম দেরী না করে সেদিকেই পা বাড়ালাম তাই।

মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর তুলনায় ছোট। চাঁদের মত অত অল্প না হলেও তার মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম। অত ভারী স্পেস-স্যুট পরেও হাত-পা চালাতে তাই কোন কষ্টই হল না। পৃথিবীতে যা কম পক্ষে পনেরো মিনিটের পথ, মিনিট দশেকের আগেই সেখানে পৌঁছে গেলাম।

শূন্যযান থেকে যা মনে হয়েছিল, কাছে যাবার পর দেখা গেল জাঁতা-পাথরের ঢিবিটা তার চেয়ে অনেক বড়।

পাথরের চাংড়ার আড়ালে সুরঞ্জনকেও দেখতে পেলাম। ঠিক দেখতে পেলাম বলা অবশ্য ভুল। লম্বা-চওড়া আকারটা দেখে বুঝলাম স্পেস-স্যুটটার ভেতর বটুক নয়—সুরঞ্জনই আছে।

কিন্তু সে একা কেন? বটুক কোথায় গেল?

স্পেস-স্যুটের স্পিকিং টিউব দিয়ে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম সুরঞ্জনকে।

তুমি এখানে বসে বসে করছ কি? বটুক তো তোমার সঙ্গেই এসেছিল। সে গেল কোথায়?

উত্তরে কোন কথা না বলে সুরঞ্জন শুধু সামনের জাঁতার মত পাথুরে ঢিবিটা হাত বাড়িয়ে দেখালে।

পাথুরে ঢিবিটা কি দেখাচ্ছে সুরঞ্জন? স্পেস-স্যুটের মুখোশে ঢাকা না থাকলে তার মুখটা দেখবার চেষ্টা করতাম।

অবাক হয়ে ঢিবিটা একবার দেখে আবার সুরঞ্জনের দিকে ফিরলাম—কি হল কি তোমার? ও ঢিবি কি দেখাচ্ছ? বটুক কোথায় গেল তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

এবার সুরঞ্জনের গলাই শোনা গেল।

—বটুক ওখানেই গেছে।

ওখানেই গেছে মানে কি? বটুক ওই পাথুরে ঢিবির মধ্যে গেছে? এ কি ভোজবাজি নাকি! না মঙ্গলগ্রহের মাটিতে মাথা খারাপ করবার কোন কিছু আছে?

সুরঞ্জনকে রহস্যটা একটু বুঝিয়ে দেবার কথা বলতে যাচ্ছি এমন সময় চোখটা দূরে একটা জায়গায় আটকে গেল।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানকার মতই আরেকটা চাপটা গোল ধরনের পাথুরে ঢিবির কাছে কি ওগুলো?

বটুক যা বলেছিল হুবহু তো তাই।

গোল গোল পর পর সাজানো কটা যেন কলসি আর জালা!

সেগুলো তো ওই ঢিবির ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে ও আসছে।

প্রথমে দুটো, তারপর একটা একটা করে আরো তিনটে।

এ কি ধরনের জানোয়ার।

সত্যিই জানোয়ার না ভৌতিক কিছু?

ভৌতিক না হলে এই পাথরের ঢিবির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কি করে?

শুধু যে বেরিয়ে আসে তা নয়, সুরঞ্জনের কথা বিশ্বাস করতে হলে তো জলজ্যান্ত অন্য কাউকে ওই পাথরের মধ্যে মিশিয়ে দিতেও পারে বলে মানতে হয়!

সুরঞ্জনও তখন জালা-মূর্তিগুলোর দিকে চেয়ে আছে।

স্পেস-স্যুটের ভেতর দিয়েই চাপা উত্তেজিত গলায় বললে, দেখতে পেয়েছেন? বিশ্বাস হয়েছে এবার বটুকের কথা?

বিশ্বাস তো হয়েছে, কিন্তু এখন কি করা উচিত তাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই অদ্ভুত মূর্তিগুলোর ভাল করে একটু পরিচয় নেবার চেষ্টা করব? বটুক কি সেই রকম কিছু করতে গিয়েই পাথরের ঢিবির মধ্যে মিশিয়ে গেছে?

মূর্তিগুলো কি ধরনের জীব তাও তো জানা নেই! নিরীহ নির্দোষ, না হিংস্র নিষ্ঠুর?

মঙ্গলগ্রহে এরকম কোন জীবের অস্তিত্বও তো কেউ কখনো কল্পনা করে নি।

কোন আজগুবী বৈজ্ঞানিক গল্পেও এরকম প্রাণীর কল্পনা আছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই।

এদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাই বা কি ভাবে করা যায়?

মূর্তিগুলো দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের যে লক্ষ্য করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দাঁড়ানোটা তাদের ধীর স্থির নয়, পাঁচটা মূর্তি অনবরতই নড়ছে চড়ছে।

ওটা কি উত্তেজনার লক্ষণ?

উত্তেজিত হওয়া আশ্চর্য তো কিছু নয়। আমরা তাদের দেখে যদি তাজ্জব হয়ে থাকি তো তাদের তো আমাদের দেখে তাই হওয়ার কথা।

প্রথমতঃ তাদের এই মঙ্গলগ্রহে এরকম অচেনা অদ্ভুত এক রকম প্রাণীর আবির্ভাবই তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ স্পেস-স্যুটে আমাদের যা চেহারা হয়েছে, কিছু না জেনে তা প্রথম দেখলে পৃথিবীর কোন সরল পাহাড়-জঙ্গলের মানুষও ভয়েই ভির্মি যেত না কি?

আমরা যেমন তাদের সম্বন্ধে কি করা উচিত ঠিক করতে পারছি না, তাদেরও অবস্থা নিশ্চয় তথৈবচ।

অবশ্য যাদের দেখছি, তারা মানুষের মত বুদ্ধিমান মঙ্গলগ্রহের কোন জীব যদি না হয় তাহলে এসব কথাই ওঠে না!

বুদ্ধিশুদ্ধি আছে বলে ধরে নিয়ে প্রথম কিভাবে তাদের বোঝানো যায় যে আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ভাব করতেই চাই?

গলার স্বর তো এখানে কোন কাজে লাগবে না। বেঢপ স্পেস-স্যুটের ভেতর থেকে কোন ইঙ্গিত করাও শক্ত। হাত-পাগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে ভাব করবার কোন ভঙ্গি দেখানো যায় কি না তাই ভাবতে হয়।

ভাববার কিন্তু আর দরকার হল না।

জালা-মূর্তিগুলো হঠাৎ দেখলাম সেই পাথরের ঢিবির দিকেই নড়তে শুরু করেছে।

'শীগগির আসুন' বলে সেই মুহূর্তেই সুরঞ্জন তার বেঢপ স্পেস-স্যুট নিয়েই মূর্তিগুলোর দিকে ছুট লাগাল।

ও কি করছ কি?—বলেও তাকে তখন অনুসরণ না করে পারলাম না।

জালা-মূর্তিগুলো আমাদের ছুটতে দেখে চঞ্চল যে হয়ে উঠেছে তা চোখেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

ওই বিদঘুটে ঢাউস শরীর নিয়েই তারা যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি চ্যাপটা ঢিবিটার আড়ালে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু সেখানে যাচ্ছে কোথায়?

আর সুরঞ্জনই বা সেদিকে অমন পাগলের মত ছুটে যাচ্ছে কেন?

মূর্তিগুলো এখন যেন পালাতেই ব্যস্ত মনে হলেও বেকায়দায় পড়ে ফিরে দাঁড়াতেও তো পারে?

তারা তখন কিরকম শত্রু হয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক কি? তাদের অস্ত্র-শস্ত্র-ক্ষমতার কথা কিছুই না জেনে এমন বেপরোয়া হয়ে তাদের ওপর চড়াও হওয়া কি উচিত?

কিন্তু সে কথা কাকে বলব!

স্পেস-স্যুটের স্পিকিং টিউবে বৃথাই দু'বার সুরঞ্জনকে সাবধান করবার চেষ্টা করলাম। সে তখন যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে।

পাঁচটা জালা-মূর্তির চারটেই ইতিমধ্যে জাঁতা-পাথরের আড়ালে অদৃশ্য।



শেষেরটাও সেখানে গা-ঢাকা দেবার আগেই সুরঞ্জন সেখানে গিয়ে পৌঁচল।

কিন্তু পৌঁছেও লাভ কিছু হল না। ওই ঢাউস জালা-মূর্তির একটাকে খালি হাতে ধরতে গেলেও হাতের বেড়ে কুলোত না। স্পেস-স্যুটের গাবদা ফোলা হাতে তাও অসম্ভব।

সুরঞ্জনকে অবশ্য সে চেষ্টা করতেও দেখলাম না! শেষ জালা-মূর্তিকে ধরবার চেষ্টা না করে তার পেছন নেওয়ার জন্যেই সে যেন ব্যস্ত।

উদ্দেশ্য তার সফলই হল। জালা-মূর্তিটার পিছু পিছু তাকেও চ্যাপ্টা পাথুরে জাঁতা-ঢিবিটার পেছনে অদৃশ্য হতে দেখলাম।

কিন্তু সে গেল কোথায়?

কয়েক সেকেণ্ড বাদেই সে জায়গায় পৌঁছে একেবারে দিশাহারা হয়ে গেলাম।

এমন দারুণ একটা ভৌতিক ব্যাপার আমার চোখের ওপরই সত্যি ঘটে গেল নাকি!

জালা-মূর্তিগুলোর সঙ্গে সুরঞ্জনও তার স্পেস-স্যুট নিয়ে মিলিয়ে গেল ওই জাঁতা-ঢিবির গায়ে?

শিগ্‌গির! শিগ্‌গির নেমে আসুন!

সুরঞ্জনের গলা শুনে চমকে না উঠলে ওইখানেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম কে জানে!

তারপর হতাশ হয়ে শূন্যযানেই ফিরতে হত।

কিন্তু সুরঞ্জনের স্পিকিং টিউবের গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা আপনা থেকেই পাথুরে ঢিবিটায় গিয়ে পড়ল। জালা-মূর্তি আর সুরঞ্জনের অন্তর্ধানের রহস্য সেইখানেই উদ্ঘাটিত!

একমুহূর্ত দেরী করবার কিন্তু তখন আর সময় নেই।

সুরঞ্জনের গলাটা যেন কোন ভাঙা লাউড স্পীকারের ভেতর দিয়ে বিশ্রী বিকৃত গোঙানো আওয়াজে শোনা যাচ্ছে।

দেরী করবেন না! দেরী···

বাকিটা আর শোনা গেল না। শোনার অপেক্ষা আমি অবশ্য করিনি।

তার আগেই ওই স্পেস-স্যুট নিয়েই প্রায় লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি জাঁতা-ঢিবিটার ধারে।

॥ এগারো ॥

হাঁ, জাঁতা-ঢিবিটার ওপরে নয়, গায়েই বিরাট একটা ফোকর। আর সেই ফোকরের নিচে বিরাট ইঁদারার মত এক গভীর গর্ত। ফোকরের ধার দিয়ে একটা গড়ানে ঢালও বাচ্চাদের স্লিপ খাবার কাঠামের মত নিচে নেমে গেছে।

ফোকর দিয়ে সেই ঢালটার ওপর দিয়েই আগের সবাই গড়িয়ে গেছে।

আমার পক্ষে সেটা কিন্তু সহজ হল না।

ফোকরটা তখনই ধীরে ধীরে বুজে আসতে শুরু করেছে। যতটুকু বুজে এসেছে ওপর থেকে দেখলে পাখুরে ঢিবিটা থেকে তা আলাদা করে চেনা অসম্ভব। বাকিটুকু বন্ধ হয়ে গেলে আগের দেখা জাঁতা-ঢিবির মত ওপর থেকে কিছু ধরাই যেত না।

আধখানা বুজে আসা ফোকরের ভেতর দিয়ে কোনরকমে গলে গেলাম বটে কিন্তু স্পেস-স্যুটের একটা হাত শেষ পর্যন্ত বুজে যাওয়া ফোকরের ফাঁকে এমন আটকে গেল যে টেনে সেটা ছাড়াতে গিয়ে একটু ছিঁড়েই গেল।

গড়ানে ঢাল দিয়ে নিচে নেমে যেতে যেতে বুকটা তখন আতঙ্কে একেবারে হিম।

স্পেস-স্যুট ছিঁড়ে যাওয়া মানে ত সর্বনাশ! পৃথিবীতে যে হাওয়ার চাপে আমরা অভ্যস্ত, শুধু তাই কমে গিয়ে শরীরের রক্ত-চলাচল থেকে সব কিছু বেসামাল হবে না, নিশ্বাসের হাওয়াই তো আর পাব না!

ওপরে কোথাও থাকলে, স্পেস-স্যুট একেবারে বিকল হওয়ার আগে কোনরকমে শূন্যযানে পৌঁছবার চেষ্টা করতে পারতাম কিন্তু এ

তো এক পাতাল-গহ্বরে কোথায় যে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছি তাই জানি না!

মাথা খুঁড়লেও এখন তো ওপরে ওঠবার আর আশা নেই।

যে ঢালটা দিয়ে নামছি সেটা আরো গড়ানে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামবার বেগ যেমন কমতে লাগলে, সুড়ঙ্গ-কূপটার গাঢ় অন্ধকারও তেমনি ফিকে হয়ে এল।

আমার বেশ কিছুটা নিচে স্লিপ খাওয়ার মত করে নামায় সুরঞ্জনের স্পেস-স্যুটটা তখন অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

সেই সঙ্গে আর কটা জিনিস যা টের পাচ্ছি সেইটেই মারাত্মক।

নিশ্বাসের কষ্টে বুকটা ক্রমশঃ যেন জাঁতা-কলে চেপে ধরছে।

প্রাণপণে হাপরের মত নিশ্বাস টেনে আর ফেলেও হাওয়ার অভাব যেন মিটছে না।

মাথাটা তখনও একেবারে ঘোলাটে হয়ে যায় নি বলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে তা একটু বুঝতে পারছি।

স্পেস-স্যুট ছিঁড়ে ফুটো হয়ে যাওয়ার দরুণ ভেতরকার হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে শরীরের ওপরকার স্বাভাবিক চাপ রাখার ব্যবস্থাটা নষ্ট হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাস যোগাবার মুখোশটাও কাজ করছে না।

বাতাসহীন এই গ্রহে যার দৌলতে এতক্ষণ প্রাণে বেঁচে চলা-ফেরা করেছি সেই মুখোশ মুখে এঁটেই এবার দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

গড়ানে ঢালটা আরো কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে জানি না কিন্তু সজ্ঞানে সেখানে পৌছনো আমার কপালে নেই।

বাতাসের অভাবের অসহ্য কষ্টটাও ক্রমশঃ তখন মাথাটা অসাড় হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্ষীণ হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

গড়িয়ে নামা শেষ হবার আগেই একটা নিবিড় অন্ধকারে মাঝে যেন ডুবে গেলাম।

ব্যাপার যা হয়েছিল তাতে জ্ঞান আর না হবারই কথা।

কিন্তু জ্ঞান তবু ফিরল। ফিরল আমার অজ্ঞান অবস্থায়ই একটা অচেতন যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায়।

প্রথম একটু হুঁশ হবার পর টের পেলাম একটা বেশ প্রশস্ত গোলাকার জায়গায় আমি পড়ে আছি আর প্রাণপণে সুরঞ্জনকে বাধা দিচ্ছি যাতে আমার মাথা থেকে খুলে ফেলা মুখোশটা সে না চাপাতে পারে।

মুখোশটা নিশ্বাসের কষ্টের পর অজ্ঞান অবস্থাতেই আমি খুলে ফেলেছি নিশ্চয়। সুরঞ্জনের সেটা আবার মাথায় পরিয়ে দেবার চেষ্টাতেও বাধা দিচ্ছি সেই অবস্থায়।

সুরঞ্জনের অবশ্য দোষ নেই। নিশ্বাসের মুখোশ খুলে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই সে সেটা চাপিয়ে দেবার জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছে। মুখোশটা আগেই বিকল হয়েছে সে আর কি করে জানবে।

মুখোশটা বিকল।

হঠাৎ মাথার ভেতর বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠেছে কথাটা।

মুখোশটা বিকল হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। নিশ্বাস নিতে না পারার যন্ত্রণায় আপনা থেকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই আমি সেটা যে খুলে ফেলেছি তাও ঠিক। কিন্তু সুরঞ্জনের খুলে ফেলার পরও বেঁচে আছি কি করে!

শুধু বেঁচে নেই, অজ্ঞান অবস্থা থেকে আবার জ্ঞানও ফিরে পেয়েছি।

কেমন করে তা সম্ভব?

তাহলে কি···?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে স্পেস-স্যুট পরা সুরঞ্জনকে একটু ঠেলে দিলাম।

তার মুখ দেখবার উপায় নেই, কিন্তু তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে

বুঝলাম ব্যাপারটা যে কতখানি অদ্ভুত ও আশ্চর্য এতক্ষণে তার মাথাতেও ঢুকেছে।

বিনা মুখোশে আমার বেঁচে থাকা আর জ্ঞান ফিরে পাওয়ার তো একটা মাত্রই মানে হয়।

মঙ্গলের ওপরের হাওয়া যেমনই হোক, এই সুড়ঙ্গ-কূপের ভেতর আমাদের নিশ্বাস নেবার মত হাওয়াই রয়েছে।

মুখোশ খুলে ফেলার পর স্পিকিং টিউবে কথা বলার উপায় নেই, সুরঞ্জনকে তাই ইঙ্গিতেই মুখোশটা খুলে ফেলতে বললাম।

বার দুই ইশারার পর নির্দেশটা বুঝলেও প্রথমটা সে একটু ভয়ই পাচ্ছিল। আমার ভরসা পেয়ে খুলে ফেলার পর তার উৎসাহ দেখে কে!

দেখছেন! সুরঞ্জন উত্তেজিত ভাবে বললে, একেবারে আমাদের পৃথিবীর মত হাওয়া, বরং আরো নির্মল পরিষ্কার, ঠিক আমাদের সমুদ্রের ধারের হাওয়ার মত। অথচ ওপরে মঙ্গলগ্রহে তো বাতাস নেই বললেই হয়। যা আছে তা পৃথিবীর হাওয়ার শতকরা এক ভাগ মাত্র ঘন। তারও বেশীর ভাগ কার্বন ডায়ক্সাইড, তাতে অক্সিজেন আর জলীয় বাষ্প যা আছে তাও ছিটেফোঁটার বেশী নয়।

সব তো বুঝলাম—সুরঞ্জনের উত্তেজিত বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বললাম—কিন্তু এই সুড়ঙ্গ-কূপে এমন হাওয়া এল কোথা থেকে? জায়গাটাও বা কি?

জায়গাটা একটু অবাক করবার মতই। যেখানটায় গড়িয়ে নেমেছি, সেটা খুব বড় সার্কাসের তাঁবুর ঘেরা খেলার অ্যারিনার মত গোল একটা জায়গা। তার একদিকে যেখান দিয়ে আমরা নেমে এসেছি সেই ঢালু সুড়ঙ্গটা ওপরে উঠে গেছে, আর একদিকে পাথরের দেয়াল ভেদ করে উপরে ওঠবার একটা চওড়া গোল সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। জায়গাটার চারিধারের মসৃণ পাথুরে দেয়ালে আর

কোন আসা-যাওয়ার ফাঁক কি দরজা কিন্তু নেই। মাথার ওপরেও নিরেট একটানা পাথুরে ছাদ একেবার নিশ্ছিদ্র।

এরকম জায়গায় আসল তাৎপর্যটা কি? শুধু একদিক দিয়ে গড়িয়ে নেমে আর একদিক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার জন্যেই জায়গাটা রাখা আছে বলে তো বিশ্বাস হয় না।

তা ছাড়া যাদের অনুসরণ করে এ গুপ্ত সুড়ঙ্গের হদিস পাওয়া গেছে সেই জালা-মূর্তিরাই বা গেল কোথায়? তাদের মত আমাদের বটুকেশ্বরেরও 'ত কোন পাত্তা নেই।

সকলের আগে বটুক কি ভাবে এই পাতাল-সুড়ঙ্গে ঢুকল সে কথা সুরঞ্জনকে এবার জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে আমি লুটভিক্‌কে কণ্ট্রোল রুমে দেখতে যাবার পর জানালা থেকে তারা আর একবার ওই জালা-মূর্তিদের দেখতে পায়। আমাকে জানিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করলে পাছে সে মূর্তিগুলির রহস্য জানার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে স্পেস-স্যুট পরে তারা তৎক্ষণাৎ শূন্যযান থেকে বেরিয়ে পড়ে।

অত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া সত্ত্বেও কোন লাভ কিন্তু হয় না।

তাদের বেরুতে দেখেই মূর্তিগুলো ওই সব জাঁতা-ঢিবির আড়ালে যায় অদৃশ্য হয়ে।

হতাশ হয়ে একটা ওই রকম ঢিবি যখন তারা পরীক্ষা করে দেখছে তখনই আশ্চর্য অভাবিত একটা ব্যাপার ঘটে।

দানবদের জাঁতার মত সেই বিরাট পাথুরে ঢিবির গা-টা যেন কোন মন্ত্রে ফাঁক হচ্ছে মনে হয়। সেখান থেকে গুটি তিনেক জালা-মূর্তিকে বেরিয়ে আসতে দেখে তারা একেবারে মড়ার মত নিশ্চল হয়েই ছিল, কিন্তু কেমন করে যেন টের পেয়ে মূর্তিগুলো নিমেষের মধ্যে আবার ঢিবির ফাঁক হওয়া গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাদের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে ফোকরটাও

তখন আবার বুজে আসতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে ফাঁক বুজে গিয়ে ঢিবির গায়ে তার আর চিহ্নই থাকে না।

বটুকের পক্ষে সেই কয়েক সেকেণ্ডই কিন্তু যথেষ্ট।

এমনিতে একটু যেন জড়ভরত। কিন্তু আসল দরকারের সময় ও একেবারে চিতাবাঘের চেয়েও চটপটে আর বেপারোয়া।

ওই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পাথুরে চিচিংফাঁক বন্ধ হবার আগেই এক লাফে সে জালা-মূর্তিদের পেছনে ওই ফোকরে ঢুকে পড়ে।

সুরঞ্জন তার পরেই যখন ঢুকতে যায় তখন পাটুরে ঢিবি আবার যন্ত্রবলে যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

কি করবে বুঝতে না পেরে ঢিবির ফোকর আবার খোলবার আশায় সে ওখানে বসে ছিল।

অন্য একটা ঢিবি থেকে আর এক দল জালা-মূর্তি বার হবার পর তাদের ফিরে যাওয়ার লক্ষণ দেখে আমাকে শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে অমন তাড়া করে ছুটে গিয়েছিল ওই ফাঁকটা খোলা থাকতে থাকতে ভেতরে ঢুকতে পাবার আশায়।

সে আশা সফল হয়েছে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে লাভ কিছু হয়নি।

বটুকেশ্বরের কোন পাত্তাই নেই, আর জালা-মূর্তিদের রহস্য যেমন ছিল তেমনি অভেদ্যই হয়ে আছে।

এখন তাহলে আমাদের কি করা উচিত? সুরঞ্জনকেই জিজ্ঞাসা করেছি, এখানে দশ বছর বসে থাকলেও আমাদের সমস্যার কিনারা হবে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ ছেঁড়া স্পেস-স্যুট নিয়ে আমার শূন্যযানে ফেরারও উপায় নেই! তার চেয়ে তুমিই ফিরে যাও সুরঞ্জন, বটুকেশ্বরের জন্যে আমিই এখানে অপেক্ষা করি যতদিন পারি।

না।— জোর দিয়ে বলেছে সুরঞ্জন।

মাথায় মুখোস দেওয়া শিরস্ত্রাণটা সে আগেই খুলে ফেলেছিল। এবার স্পেস-স্যুটটাও গা থেকে খুলে ফেলতে ফেলতে বলেছে— দু'জনের যখন যাবার উপায় নেই, এখানে তখন আমিই থাকব। আপনি আমার স্পেস-স্যুটটাই পরে শূন্যযানে ফিরে যান। আপনার জায়গায় আমি গেলে কোন লাভও হবে না। আপনি তবু লুট্ভিকের কাছে কায়দা করে শূন্যযান চালাবার কল-কৌশলগুলো শিখে নিয়েছেন। দরকার হলে তার কাছ থেকে আরো কিছু জেনে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবেন। আমি গেলে সে-রকম ফিরে যাবার কোন আশাই নেই। সুতরাং পোশাকটা পরে নিয়ে আপনি ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যান। সিঁড়িটা ওই জন্যেই আছে বলে মনে হয়···

ধৈর্য ধরে সুরঞ্জনের সব কথা শোনবার পর একটু হেসে বললাম— হৃদয়টা তোমার সত্যিই বড় সুরঞ্জন। তোমার নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করি। কিন্তু বটুকেশ্বরের খোঁজ না পেয়ে এখান থেকে আমিও যেতে পারব না। তাতে যদি সারাজীবন এখানেই কাটাতে হয় সেও ভাল। হ্যাঁ, সত্যিই তাই ভাল।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই ভাল।

যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম দু'জনে।

এ কি শুনছি?

পরিষ্কার বাংলা কথা। তাও বটুকের গলায় হলেও বুঝতাম তার গলা তো নয়ই, কোন পুরুষের গলাই নয়।

॥ বারো ॥

ঘনাদা থেমে নতুন সিগারেট ধরালেন।

ব্লাডটেস্ট গুপ্ত, প্রেসার সোম আর কার্ডিওগ্রাম সান্যালের তখন আর ধৈর্য ধরবার ক্ষমতা নেই।

পুরুষ না হলে তো মেয়ের গলা!---ব্লাডটেস্ট গুপ্তের দুচোখ কপালে।

তার ওপর বাংলা! - প্রেসার সোমের হাঁ মুখ আর বোজে না।

মঙ্গলগ্রহে বাঙালী মেয়ে! --কার্ডিওগ্রাম সান্যালের গলাই যেন শুকনো।

না, মঙ্গলগ্রহে বাঙালী মেয়ে কেউ ছিল না---ঘনাদা সিগারেটে দুটি বামটান সেরে বনোয়ারীর নিয়ে আসা দ্বিতীয় দফার চায়ের ট্রে থেকে একটি কাপ তুলে নিয়ে সশব্দে চুমুক দিতে বললেন --তবে বাঙালী ছেলেকে সেখানেই রেখে আসতে হল।

কাকে রেখে আসতে হল?—এবার আমাদের জিজ্ঞাসার পালা— ওই সুরঞ্জনকে?

হাঁ, সুরঞ্জনকে আর নিয়ে আসা গেল না। ঘনাদা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন -আর সুরঞ্জনকে রেখে এলে তার ছায়া বটুকেশ্বরকে কি আর আনা সম্ভব? তাই ভাবি, বটুকের অমন চিলের চোখ যদি না হত!

ঘনাদার আবার দীর্ঘশ্বাস।

দু-দুবার দীর্ঘশ্বাস আমাদের খুব ভাল ঠেকল না। ঘনাদার এটা ঝিমিয়ে পড়ার লক্ষণ। তাড়াতাড়ি তাই একটু তাতাবার আঁচ দিতে হল সবাই মিলে।

—ওই জালা-জন্তুগুলোই সব গণ্ডগোলের মূল, না ঘনাদা?

—বটুকের অমন চোখের জোর না হলে ওগুলো কি আর দেখা

যেত? আর দেখা না গেলে সুরঞ্জনেরও নেমে দেখবার অমন ঝোঁক হয় না, তাকে অমন রেখেও আসতে হয় না, সেই আট কোটি কিলোমিটার দূরের নির্বাসনে।

—সুরঞ্জন সেই জালা-জন্তু ধরবার লোভেই নেমেছিল নিশ্চয়! ইস্, একটা যদি ধরে আনতে পারত! আপনিও পারলেন না একটা আনতে?

অনুযোগ মেশানো শেষ জিজ্ঞাসাটা ঘনাদার মুখের দিকে বড় আশায় ছাই পড়া চেহারা নিয়ে চেয়ে।

প্রক্রিয়াটা বিফল হল না!

একটা ধরে আনবার কথা বলছ? ঘনাদা যথোচিত সাড়াই দিলেন। তা আর পারলাম কই? তার বদলে তারাই যখন সুরঞ্জনকে ধরে রাখলে তখন ছাড়িয়ে আনতে পারলাম না। ইতিহাসের খাতিরে ছেড়ে আসতে হল।

ইতিহাসের খাতিরে?—এবার আমাদের বিস্ময়টা একেবারে নির্ভেজাল।

হ্যাঁ, গ্রহটার ভাবী ইতিহাসের একটা দাবী তো আছে।—ঘনাদা বিশ্বত্রাতার করুণাঘন হাসি হাসলেন, সে দাবী অগ্রাহ্য করতে পারলাম না।

মঙ্গলের ভাবী ইতিহাসের দাবী শুনে চোখে তখন অন্ধকার দেখছি। তবু কথাটা চালু রাখবার জন্যে বিজ্ঞতার নামে বৃদ্ধ সেজে বলতে হল—ঠিক, ঠিক! ইতিহাসের দাবী না মানলে চলে? নইলে সেখানেই হয়তো নিশান নিয়ে আমাদের দাবী মানতে হবে বলে ঘেরাও করত ইতিহাসের দল।

না, এ সেরকম দাবী নয়। ঘনাদা অনুকম্পা ভরে সংশোধন করতে পেরে খুশি হয়ে বললেন—দাবী হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের ইতিহাসের ধারার। সে ধারা তো শুকিয়ে গিয়ে তখন শেষ হতেই বসেছে, মঙ্গলগ্রহের ওপরটা অনেকদিন আগে থেকেই আমাদের বিজ্ঞান যা

জেনেছে সেই শ্মশান। সেখানে প্রাণের চিহ্ন না পাবারাই কথা কিন্তু তা না পেয়ে ও গ্রহে প্রাণই নেই ভাবা একেবারে ভুল শুধু নয়, বৈজ্ঞানিকদের কল্পনারও অভাব তাতে প্রমাণ হয়। গ্রহের ওপরে প্রাণ না থাকলে কি তলাতেও থাকতে পারে না? মঙ্গলগ্রহে ঘটেছিল ঠিক তাই। সেখানে প্রাণের বিকাশ আর বিবর্তন আমাদের পৃথিবীর অনেক আগেই হয়, তারপর আমাদেরই মত পারমাণবিক যুগে পৌঁছে নিজেদের হিংসা-প্রতিহিংসার যুদ্ধে আর স্বাভাবিক কারণে গ্রহের ওপরটা প্রাণীদের বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। মঙ্গলের যারা সেরা প্রাণী সেই মাঙ্গলিকেরা এ সম্ভাবনার কথা ভেবে অনেক আগে থেকেই মাটির ওপরের স্তরের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে সব পাতাল শহর বসাবার কাজ শুরু করে রেখেছিল। হাওয়া ফুরিয়ে জল উবে গিয়ে সূর্যের মারাত্মক আল্ট্রা-ভয়োলেট আর মহাকাশের কস্মিক-রশ্মির বর্ষণে ওপরে টিকে থাকা যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন মাঙ্গলিকদের যারা তখনও বেঁচে ছিল সবাই ওই পাতাল রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়, কিন্তু সেখানেও নিয়তির নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায় না। ওপর ছেড়ে পাতালে নামবার সময় যে মাঙ্গলিকেরা কমতে কমতেও সংখ্যায় অন্ততঃ লাখ দুয়েক ছিল, আমাদের ও গ্রহে নামবার সময় তারা শেষ পর্যন্ত মাত্র গুটি দশেকে এসে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, তাদের আবার···

ওই জালা-মূর্তির মত চেহারা?—প্রেসার সোম নিজেকে সামলাতে পারেন না। প্রমাদ গণতে শুরু করে আমরা তখন ঘনাদার মুখের দিকে চেয়ে আছি।

এমন করে বেমক্কা কথার সূতো ছেঁড়ার জন্যে আসরই বুঝি যায় ভেস্তে।

কিন্তু ভাগ্য ভাল। মাংসের সিঙাড়া তোতাপুলির সঙ্গে শিশিরের সিগারেটগুলোই ধাক্কা সামলালে। ঘনাদার মুখে-চোখে একটু ঘনঘটা হওয়ার সূত্রপাত হয়েই কেটে গেল।

মাঙ্গলিকদের জালা-মূর্তির মত চেহারা? ঘনাদা প্রেসার সোমকে যেন বহুকষ্টে নিরীক্ষণ করতে পেরে বললেন—না।

গলাটা রীতিমত গম্ভীর।

তা হোক, কারেন্ট এখনো আছে। আমরা ডবল ফিউস তার লাগালাম।

—সেই বাংলা শোনার পর একেবারে হকচকিয়ে গেছলেন, না ঘনাদা?

—মঙ্গলগ্রহে বাংলা! তাও আমার মেয়ের গলায়!

—আজগুবী ব্যাপার!

যত আজগুবীই হোক মানেটা কি আর ঘনাদা পান নি?

হ্যাঁ পেলাম। ঘনাদা প্রসন্ন হয়ে জানালেন—পেলাম নাটকের ভেতর দিয়ে বলা যায়। বাংলায় ওই নেপথ্য-বাণীর পরই সে নাটক যেন আপনা থেকে শুরু হল।

যেখানে তখন পৌঁছেছি, আগেই বলেছি যে সে জায়গাটা সার্কাসের অ্যারিনার মত গোল। একদিকে একটা গড়ানে সুড়ঙ্গ ঢাল আর একদিকে ঘোরানো সিঁড়ি বাদে চারিধারে ওপরের নিরেট ছাদ পর্যন্ত শুধু খাড়া দেয়াল।

সে খাড়া দেয়ালগুলো হঠাৎ চতুর্দিকেই ফাঁক হয়ে গিয়ে সেখান থেকে এক এক করে গুটি দশেক জালা-মূর্তিই বেরিয়ে এল।

সে জালা-মূর্তির পেছনে আর কেউ নয়, স্পেস-স্যুট ছেড়ে তার ঘরোয়া পোশাকে আমাদের বটুকেশ্বর।

একি কাণ্ড বটুক!—আমার আগে সুরঞ্জনই চেঁচিয়ে উঠল—তুমি এদের সঙ্গে করছ কি! এরা কারা?

এরা বাংলা জানল কি করে? তুমি শিখিয়েছ?

এতগুলো প্রশ্নের বাণেও অবিচলিত বটুক তার সেই মুখস্থ পড়ার শুধু শেষ জিজ্ঞাসাটারই জবাব দিলে—শেখাতে এদের হয় না।

পর মুহূর্তেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সে বিরাট পাতাল-মঞ্চ ঝন ঝন করে উঠল।

দশ দশটা মেয়ের গলায় এক সঙ্গে শোনা গেল শেখাতে এদের হয় না।'

বুঝলেন এবার! বটুক তার সেই এক পর্দার গলায় জানালে—এরা সব হরবোলা। যা শুনবে তাই নকল করতে পারে।

আবার সেই জালা-মূর্তির ভেতর থেকে দশ দশটা মিহি গলায় শুনলাম—বুঝলেন এবার! এরা সব হরবোলা। যা শুনবে তাই নকল করতে পারে।

হ্যাঁ হরবোলা যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কথাগুলো বটুক যা বলছে তাই, কিন্তু পর্দাগুলো এক নয়। ওই একই কথা মিহিগলায় নানা পর্দায় যেন জলতরঙ্গ বাজিয়ে দিলে।

কিন্তু ওই জালা বসানো চেহারার ভেতর থেকে এমন মেয়ের গলা বার হয় কি করে?

সেই কথাই জিজ্ঞসা করলাম বটুককে।

একরকম ভেংচানো ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও অবশ্য চলল সঙ্গে সঙ্গে। বটুক যা জবাব দিলে তারাও তাই।

দেখবেন তাহলে? বলে বটুক অমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করে বসবে তখন কি জানি?

মাপ করবেন তাহলে একটু—বলে বটুক আচমকা তার গায়ের জমাটাই ফেললে খুলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে দশ মুখে তার প্রতিধ্বনির সঙ্গে যা হল তা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত।

দশ দিকে দশ দশটা জালা-মূর্তি ঝপ ঝপ করে তাদের মাথায় আর গায়ের জালা-পোশাকগুলো নামিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। আমাদের স্পেস-স্যুটের মত জালা-পোশাকগুলো তাদের মঙ্গলের ওপরে যাবার বেশ।

সেই পোষাক খোলার পর তাদের আসল চেহারা দেখলাম। সেই সঙ্গে খিল খিল করে হাসিটা ফাউ।

কিন্তু একি দেখছি!

দশ দশটা মেয়ের কাকে ছেড়ে কাকে দেখব! সব যেন তিলোত্তমার ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালা।

কিন্তু দশটাই মেয়ে? প্রশ্নটা কাড়িগ্রাম সান্যালের ছেলে নেই?

না। ঘনাদা একটু যেন দুঃখের হাসি হাসলেন—সেই কথাই তখন বলতে যাচ্ছিলাম। মাঙ্গালিকরা কমতে কমতে শুধু মাত্র দশটাতেই পৌঁছয় নি, তাদের সবাই আবার মেয়ে।' তারা একবার হাতে পেলে কি ছাড়ে। বটুককে আগেই ধরেছিল, সুরঞ্জনকেও ছাড়ল না। মঙ্গলগ্রহের ইতিহাসটা যাতে অচল না হয়ে যায় জোর করে ফিরিয়ে আনতেও তাই মন উঠল না।

আর আপনি! হাসিটাকে ঠোঁট টিপে চেপে জিজ্ঞাসা করলে শিবু—আপনাকে যে ছেড়ে দিলে?

আমাকে! ঘনাদা যেন ক্ষণিকের জন্যে উদাস হয়ে গেলেন।—আমাকে কি আর ছাড়তে চায়। পৃথিবী থেকে আরো ছেলে আনবার ভরসা দিয়ে অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়ে এসেছি।

সে কথা আর রাখতে পারেন নি তো? গৌরের গভীর আফসোস।

কি করে আর রাখব! ঘনাদার হতাশ স্বীকৃতি—প্রথমতঃ পাতালপুরীর যে নামটা দিয়েছিলাম সেই ধাঁধিকা থেকে সুরঞ্জনেরই স্পেস-স্যুট পরে বেরিয়ে আসবার মুখেই আবার সেই বুকের কষ্ট। কি ভাগ্যি, কাঠ-পোড়া ছাই একটু সঙ্গে রেখেছিলাম। তাই মুখে দিয়ে তখনকার মত ধাক্কাটা সামলালাম।

ঘনাদা থামলেন। তারপর আমাদের মুখগুলোর দিকে চেয়ে একটু বুঝি করুণা হওয়াতেই সদয় হয়ে ব্যাখ্যাটা আর চেপে রাখলেন না।

ভাবছ, ছাই দিয়ে হার্টের অসুখ সারে কি করে? সব হার্টের অসুখ তো নয়, মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ায় ফল হিসেবে অ্যাস্ট্রানট বা মহাকাশযাত্রীদের যে হার্টের গোল দেখা যায়, সেই অসুখ শুধু ওই ছাইয়ে সারে। আকাশপথে অনেককাল ভারশূন্য থাকবার ফলে সকলেরই শরীর থেকে পটাসিয়াম স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী বেরিয়ে যায়। কারুর আরো বেশী। পটাসিয়াম কম থাকলে হার্টের বৈদ্যুতিক প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয়ে হৃদযন্ত্রের ছন্দ কেটে যায়। মহাকাশ-যাত্রীদের খাবারে তাই একটু বেশী পটাসিয়াম থাকা দরকার। পটাসিয়াম বড় মজার এলিমেণ্ট। দুনিয়ায় তিনি একা থাকেন না। সায়ানাইডের সঙ্গে মিশে যা বিষ সেই পটাসিয়াম আবার অন্য সংসর্গে অমৃতের সামিল। লুটভিকের শূন্যযানে হার্টের গোল যখন প্রথম শুরু হল তখন পটাসিয়াম আর কোথায় পাব। টেবিলের কাঠের পায়া পুড়িয়ে তাই তা যোগাড় করতে হল। এককালে কাঠের ছাই থেকেই পটাসিয়াম কার্বনেট সংগ্রহ করা হত।

কাঠের ছাই খেয়ে সুস্থ হয়ে শূন্যযানে যখন ফিরে এলাম তখন সত্যিই মনে মনে আবার মঙ্গলে একদল আইবুড়ো নিয়ে যাবার কল্পনা ছিল। কিন্তু তা আর হল না। আমার জন্যে অপেক্ষা করে এতদিনে সেখানে আমাদের কুলীন বামুন কি আমেরিকার মর্মনদের মত বহুবিবাহ যদি ওরা চালু করে দিয়ে থাকে, তাহলে দোষ দেবার কিছু নেই।

কিন্তু সত্যিই আর সেখানে ফিরলেন না কেন?—প্রেসার সোমের আকুল জিজ্ঞাসা—শূন্যযানটা নিয়ে পৃথিবীতে যে ফিরেছিলেন তাতে তো আর সন্দেহ নেই।

না, তোমাদের সামনে সশরীরে যখন উপস্থিত—ঘনাদার মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি—তখন ফেরার কথা অস্বীকার করি কি করে! কিন্তু ফেরার পর ওই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক লুটভিক্ই যে শয়তানি করল! আমার ওপর তার দারুণ আক্রোশ। তবু ফিরে আসবার সময় তার

আশ্চর্য যন্ত্রের সৃষ্টিছাড়া রহস্য সে আমাকে যেন ঘৃণাভরেই বুঝিয়েছে। রকেট-টকেট নয়, এ আশ্চর্য শূন্যযান চলে আন্টি-ম্যাটারের জোরে। অ্যান্টি-ম্যাটার মানে হল আমাদের দুনিয়ার মূল উপাদানের যেন আয়নায় দেখা উল্টো নকল। সে অ্যান্টি-ম্যাটারের হাইড্রোজেন অ্যাটমে একটা প্রোটনের চারিধারে একটা ইলেকট্রন ঘোরে না। নেগেটিভ অ্যান্টিপ্রোটনের চারিধারেই ঘোরে পজিটিভ পজিট্রন। অন্য সব উপাদানও তাই। এই অ্যান্টি-ম্যাটারের আঁচ পেলেও কেউ তা এখনো সৃষ্টি করতে পারে নি। করেছে শুধু ওই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক লুটভিক্। অ্যান্টি-ম্যাটারের সঙ্গে ম্যাটারের সম্পর্ক অহি-নকুলের চেয়ে শত্রুতার, অ্যান্টি-ম্যাটারে ম্যাটারে দেখা হলে দু'জনেই একেবারে বিদ্যুৎবেগে যায় দু'জনের কাছ থেকে ছিটকে। সে দুই বস্তুর ওই ধর্ম কাজে লাগিয়ে লুটভিক্ থরের মরুভূমির মাঝে তার আশ্চর্য যন্ত্রযান বানিয়েছিল। পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে সে শূন্যযানের রকেটের মত অসম্ভব বেগ লাগে না। যেমন খুশি বেগে বেলুনের মত ভাসতে ভাসতেও তারা পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারে। হাওয়ার ঘর্ষণে পুড়ে যাবার ভয় তাই আমাদের শূন্যযানের ছিল না। সাধারণ আসবার-পত্রও সেখানে বাতিল করতে হয় নি। একেবারে শামুকের থেকে অ্যান্টি-ম্যাটারে ধীরে ধীরে প্রায় আলোর গতিতে তোলা যায় বলে মহাশূন্যে বেগ বাড়াবার সময় ভারশূন্যতা ছাড়া অন্য কোন অসুবিধা আমাদের ভোগ করতে হয় নি। মঙ্গলগ্রহে নামতেও পেরেছি নিরাপদে!

তেমনি নিরাপদেই আবার থরের সেই মরুপ্রান্তরেই এসে নেমেছিলাম। নামার পর লুটভিক্‌কে আর বেঁধে রাখতে নিজের বিবেকেই বেধেছে। তাকে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাই বাঁধন খুলে দিয়ে লোকালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বাইরে বেরিয়ে এসেছি।

বেশী দূর তারপর আর যেতে হয়নি। কিছু দূর যেতে না যেতেই

একটা যেন উল্টো বজ্রাপাত হয়েছে। মরুর বালি থেকেই একটা বিদ্যুৎশিখা যেন নিমেষে আকাশে উঠে বিরাট একটা আগুনের হল্কা হয়ে মিলিয়ে গেছে।

সেই উল্টো বজ্রপাতের ধাক্কাতেই বালির ওপর তখন মুখ থুবড়ে পড়েছি। কিছুক্ষণ বাদে উঠে বসে মুখ ঘুরিয়ে শূন্যযানটাকে আর দেখতে পাই নি। লুটভিক্ তার সঙ্গেই নিজেকে শেষ করেছে, না, অন্য কোন দিকে আগে পালিয়েছে, তা জানি না এখনো।

আচ্ছা!—ঘনাদা থামতে কার্ডিওগ্রাম সান্যাল শেষ সংশয়টা আর প্রকাশ না করে পারলেন—মাঙ্গলিকদের অমন মানুষের চেহারা হল কি করে? তারা তো মানুষ নয়!

না, তারা মানুষ নয়, কিন্তু আমরাই তো আসলে মাঙ্গালিক হতে পারি!—ঘনাদা শেষ ধাঁধাটি ছাড়লেন—লক্ষ লক্ষ বছর আগে মাঙ্গলিকরাই এসে পৃথিবীতে মানুষ জাতের গোড়াপত্তন যে করে নি তা কে বলতে পারে! মিসিং লিংক এখনো তো ঠিক পাওয়া যায় নি।

এর পর আমাদের চোখগুলো যদি চড়কগাছ হয় তাহলে সে কি চোখের দোষ?

॥ শেষ ॥